হরকিশোরবাবু

হরিশংকর জলদাস

BanglaBook.org

হরকিশোরবাবু

হরিশংকর জলদাস

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অন্যপ্রকাশ

গ্রন্থস্বত্ব © লেখক
প্রথম প্রকাশ : একুশের বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

লেখক এবং প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনো যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সম্বলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না। বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেট মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রকাশক : মাজহারুল ইসলাম, অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৮০২
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
মুদ্রণ : কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা
মূল্য : ২২৫ টাকা [১০ মার্কিন ডলার]

Horokishorbabu
by Harishankar Jaldas

Published in Bangladesh
by Mazharul Islam, Anyaprokash
e-mail : anyaprokash38@gmail.com
web : www.e-anyaprokash.com

ISBN : 978 984 502 164 7

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
যাঁর সামনে আমি নতমস্তকে দাঁড়িয়ে আছি।

সূচি

হরকিশোরবাবু ৯
দেহ ২০
রতন ২৯
খুতু ৪০
হৃদয়কথা ৫৬
সুবল জেঠা ৬২
ম্যাডাম ৭০
অধরা ৭৯
সোনালি আঁধার ৯০
আহব ইদানীং ৯৭

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

হরকিশোরবাবু

সেদিন সকাল সাতটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে হরকিশোরবাবু মারা গেলেন। বই চাপা পড়েই মারা গেলেন তিনি।

তাঁর মারা যাওয়ার অন্য কোনো কারণ ছিল না। বয়স তাঁর পঞ্চান্ন হলেও শরীরে কোনো রোগবালাই ছিল না। প্রেসার ছিল নর্মাল, ডায়াবেটিস, ক্ষুধামন্দা, মাথা ঝিম ঝিম, হাঁটতে কষ্ট—কোনোটাই ছিল না হরকিশোরবাবুর। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির হরকিশোরবাবুর শরীর ছিল সুঠাম, শুধু গলার চামড়াটা কুঁচকে গিয়েছিল সামান্য। সাধারণ বাঙালির মতো পেটটা শরীরের বাইরে ইঞ্চি আড়াই বাড়া ছিল। ধবধবে সাদা হয়ে যাওয়া পাতলা চুলে কলপ দিতেন। কলপ দিলে অনেকের ইনফেক্‌শন হয়, হরকিশোরবাবুর হতো না। সপ্তাহের দু'-তিন দিন সকাল বা বিকেলের দিকে কর্ণফুলীর পাড়ে হাঁটতেন তিনি। হাঁটতে হাঁটতে হাত-পা নাড়তেন, বড় বড় শ্বাস নিতেন। বলতেন, 'শরীর ঠিক রাখার জন্য নদীপাড়ে সপ্তাহে দু'-তিন দিন হাঁটলেই যথেষ্ট। এতেই শরীর ঠিক থাকে।' হরকিশোরবাবুর শরীর ঠিক ছিল। তারপরও তাঁকে মরতে হলো। সকালবেলাতে বই আর বুকসেল্‌ফের নিচে পড়ে মরতে হলো তাঁকে।

একটা কলেজে অধ্যাপনা করতেন তিনি। সংসারে স্ত্রী, এক পুত্র, দুই কন্যা। বড় মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছেন। ঘটক বলেছিল—বর বড় চাকরি করে ঢাকায়, এমএ পাস। হরকিশোরবাবু ভালো করে খোঁজখবর না নিয়ে বিয়েতে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। স্ত্রী বলেছিলেন, 'তাড়াহুড়োর দরকার নেই। খোঁজখবর নাও—বাড়িঘর, মা-বাবা, চাকরি, বেতন—এসবের।'

হরকিশোরবাবু বলেছিলেন, 'ঘটক আমার দীর্ঘদিনের চেনা। মিথ্যে বলবে না। ছেলের সঙ্গে আমার ফোনে কথা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে ছেলের মা-বাপ আসবেন। দেখা হবে তাঁদের সঙ্গে। ঘরবাড়ির কথা বলছ ? এখন গ্রামে কেউ থাকে নাকি ? গ্রামের ভিটেবাড়ির খবর নিয়ে লাভ কী ? শহরেই থাকবে তোমার মেয়ে।'

বড় মেয়েটির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। পরে জানা গেছে—জামাই একটি বেসরকারি অফিসের কেরানি। স্বল্প বেতন। চেহারাটা শুধু সুন্দর। তবে মাকালফল। বিয়ের পর থেকে দারিদ্র্যে খাবি খাচ্ছে বড় মেয়েটি। একটি ছেলে হয়েছে, আরেক সন্তান হয় হয়। কারণে অকারণে চলে আসে শিউলি বাপের বাড়ি। অভাবের নামতা পড়ে মায়ের সামনে। মা ঝামটা দেয়, 'আমার সামনে ঘ্যানরঘ্যানর করস কেন ? যাস না ক্যান পরভেসারের কাছে। গিয়ে বল—মাসে মাসে মাসোহারা দিতে হবে আমাকে। কেন ঠেলে দিয়েছিলে আমাকে ও রকম হাভাইত্যার ঘরে ?'

BanglaBook.org

শিউলি বাপের সামনে যায় না। মায়ের মন নরম হয়ে আসে। যাওয়ার সময় মেয়ের হাতে দু' চার পাঁচ শ' টাকা গুঁজে দেয়।

ছোট মেয়েটি এসএসসি পাস করল। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে কম জিপিএ পেয়ে পাস করেছে বেলি। হরকিশোরবাবু বলে দিয়েছেন, 'সরকারি কলেজে ভর্তির আশা নেই। বেসরকারি কলেজেই পড়তে হবে বেলিকে।'

ফুলের প্রতি গভীর ভালোবাসা হরকিশোরবাবুর। তাই মেয়েদের নাম রেখেছেন শিউলি, বেলি। ছোট একটি বারান্দা আছে তাঁর ফ্ল্যাটে। ওখানে নানা ফুলগাছের টব। হাসনাহেনা, জবা, বেলি, অপরাজিতা, গাঁদা—এসব ফুলগাছ টবে টবে। সন্ধের দিকে কলেজ থেকে ফিরেন হরকিশোরবাবু। মুখ-হাত ধোয়ার আগে টবে টবে পানি দেন। গোটা দিনের রোদে আধমরা পাতাগুলো সতেজ হয়ে ওঠে। পাতায় পাতায় হাত বুলান আর বিড়বিড় করে কী সব যেন বলেন হরকিশোরবাবু!

সুকুমারী একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বিড়বিড় করে কী বল তুমি ?'

'গাছের সাথে কথা বলি।'

সুকুমারী হরকিশোরবাবুর কথার অর্থ বুঝতে পারেন না। গজর গজর করতে করতে স্থানান্তরে যান।

বিয়ের পর স্ত্রী সুকুমারীর নামটাও পাল্টে দিতে চেয়েছিলেন হরকিশোরবাবু। কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে সুকুমারীকে টগর বলে ডেকে ফেলেছিলেন তিনি। মুখে ঝামটা দিয়ে সুকুমারী বলেছিলেন, 'এসব কী ? টগর মানে কী ? আমার নাম সুকুমারী, মা-বাবার দেওয়া নাম। এটা পাল্টে টগর কেন ? টগর কে ? ও বুঝেছি, আগের প্রেমিকা! তা টগরে গন্ধ ছিল তো ? গন্ধ যদি ছিল তো সুকুমারীকে বিয়ে করা কেন ?'

বোকা বনে গিয়েছিলেন সেদিন হরকিশোরবাবু। ফুলকে তিনি ভালোবাসেন। এমন ভালোবাসেন যে, পারলে পৃথিবীর সবকিছুর নাম ফুলের নামে রাখেন। কিন্তু পৃথিবী তো তাঁর আজ্ঞাধীন নয়! তাই আপনজনের নাম ফুলের নামে রেখে আনন্দ পেতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সুকুমারী কিসের সঙ্গে কী মিলাল ? ব্যথায় টনটনিয়ে উঠেছিল হরকিশোরবাবুর বুকটি। গলায় জোর ঢেলে বলেছিলেন, 'কিসের মধ্যে কী, পান্তাভাতে ঘি! তুমি বড় সন্দেহপ্রবণ সুকুমারী। সন্দেহ সব সময় তোমাকে কুরে কুরে খায়। ভালোবেসে তোমাকে টগর ডেকেছি। সেখানে মিথ্যে প্রেমিকার খোঁচা!'

'নাম পাল্টাবার ইচ্ছে কেন তোমার ? সুকুমারী নামে ভালোবাসা জানানো যায় না ?' একটু থেমে সুকুমারী আবার বলেছিলেন, 'তা, মা-বাবার দেওয়া নামে হস্তক্ষেপ কেন ?' তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন সুকুমারী, 'এটা তো শুধু তোমার অভ্যাস নয়। তোমরা পুরুষরা তো এরকমই হও।'

'মানে!' অবাক হয়েছিলেন হরকিশোরবাবু।

BanglaBook.org

‘তোমার রবীন্দ্রনাথ বউয়ের নাম পাল্টে দিয়েছিলেন, তাঁর দেখাদেখি নজরুলও একই কাজ করেছিলেন। তাঁদেরই তো চেলা তুমি! বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। রবীন্দ্র-নজরুল বদলালেন, তুমি বদলাবে না!’ সুকুমারী বলেছিলেন।

হরকিশোরবাবু উষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘এত রহস্য করছ কেন ? খুলে বল না।’

সুকুমারী ব্যঙ্গের সঙ্গে বলেছিলেন, ‘কেন রবীন্দ্রনাথ ভবতারিণীর নাম পাল্টে মৃণালিনী আর নজরুল আশালতার নাম পাল্টে প্রমীলা রাখেন নি! মুখে তো অনেক বড় বড় কথা—নারীস্বাধীনতা, নারীস্বাধীনতা। নারীস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে তো তোমাদের বাধে না!’

‘কী আশ্চর্য! কিসের মধ্যে কিসের ব্যাখ্যা!’ হরকিশোরবাবু বলেছিলেন।

‘আশ্চর্য বল আর যাই বল, আমার সঙ্গে ওসব চুদুর-ভুদুর চলবে না। ওসব টগর গোলাপ নিয়ে অন্যের সঙ্গে পুটুর-পাটুর কোরো, আমার সঙ্গে না।’ বলে হন হন করে রান্নঘরের দিকে চলে গেলেন সুকুমারী।

পেছনে স্বগত কণ্ঠে হরকিশোরবাবু বললেন, ‘চুদুর-ভুদুর, পুটুর-পাটুর—এসব কথার মানে কী!’

স্ত্রীর দুঃখে সন্তানদের নাম রাখলেন তিনি ফুলের নামে। ছেলে হলে নাম দিলেন অম্লানকুসুম। মেয়েদের দিলেন শিউলি বেলি।

সন্তানদের এরকম নাম রাখার ব্যাপারে সুকুমারী বাধ সেধেছিলেন। কিন্তু কেন জানি সেদিন হরকিশোরবাবু খুব পৌরুষের পরিচয় দিয়েছিলেন। তর্জনী উঁচিয়ে স্ত্রীকে বলেছিলেন, ‘তোমার ছেলেমেয়ের নাম তুমি গেন্দা, চকলেট, পেপসি, ফয়’স লেক যা ইচ্ছে রাখো। আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমার ইচ্ছেয় হস্তক্ষেপ করবে না বলে দিলাম। তেরিমেরি করলে বহুত অসুবিধা হবে।’

হরকিশোরবাবুর সেদিনের চেহারা দেখে ভড়কে গিয়েছিলেন সুকুমারী। সেদিন কথা বাড়াতে আর সাহস করেন নি। হরকিশোরবাবুর ইচ্ছেতেই ছেলেমেয়ের নাম অম্লানকুসুম শিউলি বেলি থেকে গিয়েছিল।

হরকিশোরবাবু একটু আধটু লেখালেখি করেন। দু’-চারটা বইও বেরিয়েছে এর মধ্যে। একটা বই কী যেন একটা পুরস্কারও পেয়েছে। পুরস্কার পাওয়ার পর বইবাজারে হরকিশোরবাবুর একটু ডিমান্ড হয়েছে। হরকিশোরবাবু যত্ন করে বই লেখেন। উপন্যাসই লেখেন তিনি। উপন্যাস লেখার কথা ছিল না তাঁর। ছোটবেলা থেকে বই সংগ্রহ করতেন তিনি, মনোযোগ দিয়ে বই পড়তেন। স্কুলের হেডস্যার তাকে হরপোকা বলে ডাকতেন। দপ্তরিকে বলতেন, ‘হরপোকাকে ডেকে আন।’

দপ্তরি জিজ্ঞেস করত, ‘হরপোকা কে স্যার ?’

BanglaBook.org

'আরে বেটা! হরকিশোর আর কি ? দেখস না হরদম বইয়ের মধ্যে নাক চোখ ডুবিয়ে বসে থাকে। বইপোকা সে। হরকিশোরের হর আর বইপোকার পোকা। দুটো মিলে হরপোকা। যা যা ডেকে আন।' বলে হা হা করে হেসে উঠতেন হেডস্যার।

বই পড়ে পড়ে নিজের মধ্যে একটা ভাবনার জগৎ তৈরি করে ফেলেছিলেন হরকিশোরবাবু।

একদিন বাংলাবিভাগে বসে আছেন তিনি। ওই সময় ক্লাস ছিল না তাঁর। বিভাগীয় প্রধান আইয়ুব ভূঁইয়া হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'হরকিশোরবাবু, মানিকের পদ্মানদীর মাঝি আপনার কেমন লাগে ?'

আইয়ুব ভূঁইয়া নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাসের ওপর পিএইচডি করেছেন। মানিক তাঁর ভালো করে পড়া। হরকিশোরবাবু শুনেছেন—পদ্মানদীর মাঝি তাঁর থিসিসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিভাগীয় প্রধানের প্রশ্নে হরকিশোরবাবু একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন সেদিন। আইয়ুব ভূঁইয়ার প্রশ্নকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আইয়ুব ভূঁইয়া নাছোড়।

হরকিশোর বলেছিলেন, 'পদ্মানদীর মাঝি আমার পছন্দ না স্যার।'

'কেন কেন ? যে বই নিয়ে বাঙালি অহংকার করে, আপনি বলছেন সেই বই আপনার পছন্দের না!'

'স্যার, আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আপনাকে একটা প্রশ্ন করি।'

ভূঁইয়াসাহেব একটু ইতঃস্তত করে বললেন, 'করেন।'

'মানুষ পাচার করা আজকালকার সমাজে অপরাধ কি না ? মাদকদ্রব্য চোরাচালান সমাজে আজও নিন্দনীয় আর বেআইনি কি না ?' হরকিশোরবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, এ দুটো ব্যাপার তো নিন্দনীয় এবং বেআইনি।' আইয়ুব ভূঁইয়া বললেন।

হরকিশোরবাবু বললেন, 'এখন যেমন নিন্দনীয় ১৯৩৫-৩৬ সালেও নিশ্চয় নিন্দনীয় ছিল।'

'তা তো বটেই।'

'এই দুটো বেআইনি ও নিন্দনীয় ব্যাপারকে মানিক তাঁর পদ্মানদীর মাঝিতে প্রশ্রয় দিয়েছেন। হোসেন মিয়াকে দিয়ে এ দুটো বেআইনি কাজ করিয়েছেন তিনি। এজন্যে পদ্মানদীর মাঝি আমার ভালো লাগে না স্যার।' হরকিশোরবাবু বেশ আস্থার সঙ্গে কথাগুলো বললেন।

প্রিয় লেখক সম্পর্কে বদনাম আইয়ুব ভূঁইয়া সহ্য করলেন না। নন্দিত বইয়ের নিন্দিত ব্যাখ্যা—মানতে নারাজ তিনি। উষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'বাজে সমালোচনাই করলেন শুধু হরকিশোরবাবু। নিজে তো এক কলমও কোনোদিন লেখেন নি। নিন্দে করতে পঞ্চগলা।'

BanglaBook.org

'লিখব স্যার।'

'কী লিখবেন ? ঘোড়াড্ডিম!' হরকিশোরবাবু না শুনতে পায় মতন করে বললেন আইয়ুব ভূঁইয়া।

'ঘোড়াড্ডিম না স্যার। উপন্যাসই লিখব। জেলেদের নিয়ে। দেখবেন স্যার আমার বই মানুষে পড়বে।' দৃঢ়কণ্ঠে কথাগুলো বলেছিলেন হরকিশোরবাবু।

অধিক বয়সে কলম ধরেছিলেন তিনি। লিখেছিলেন 'ধীবরখণ্ড' নামের উপন্যাস। পাঠকেরা পড়েছিলেন সেই বই।

সেই থেকে তাঁর লেখালেখি। জীবনের নানা জটিলতার মধ্যেও লিখে গেছেন তিনি। প্রকাশকেরাও এগিয়ে এসেছেন। দাবি করেছেন, 'আপনার প্রথম বইয়ের মতো একটা উপন্যাস দেন স্যার।'

হরকিশোরবাবু প্রথম বইয়ের মতো উপন্যাস লেখেন না। তবে তাঁর সকল উপন্যাসের কেন্দ্রে থাকে সাধারণ প্রান্তিক মানুষজন। জেলে, মেথর, বেশ্যা, খুনি—এসব।

উপন্যাস লেখার জন্যে নানা বই পড়া দরকার। বই পড়তে গেলে কিনতে হয়। হরকিশোরবাবুর পক্ষে বই কেনা সহজ, কিন্তু বই নিয়ে ঘরে ঢোকা সহজ নয়। সুকুমারীর এক কথা, 'অপচয় করা চলবে না। ছাইপাঁশ কিনে কিনে ঘর ভরিয়েছ। এখানে ওখানে, বিছানার কাছে, পায়ের পাশে বইয়ের স্তূপ। তেলাপোকার আস্তানা হয়ে গেছে গোটা বাসা। পা বাড়াবার জায়গা নেই।' একটু থেমে সুকুমারী আবার বলেছিলেন, 'তারপর ধরেছে দেয়াল। সেল্‌ফে সেল্‌ফে ভরিয়ে তুলেছে চারদিকের দেয়াল। ছোট একটি পড়ার টেবিল। সেই টেবিলের ডান পাশে একটা জানালা ছিল। সেই জানালাঘেঁষা দেয়ালেও ভারী কাঠের সেল্‌ফ। সেল্‌ফভর্তি বই আর বই। বই দিয়ে দু'-চারজন মানুষকে শ্মশানে পোড়ানো যাবে। আর না, আর কেনা যাবে না বই।'

'বই না কিনলে লিখব কেমনে ?' হরকিশোরবাবু ম্লান কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন।

ঠোঁট উল্টে সুকুমারী বলেন, 'লিখবার জন্যে বই কিনতে হয় নাকি ? যত্তসব ন্যাকামি! আর কোনোদিন বই নিয়ে ঘরে ঢুকবে না, বলে দিলাম।'

তারপরও বই কেনেন হরকিশোরবাবু। সন্ধের দিকেই সময় পান বইদোকানে যাওয়ার। পছন্দের বই কেনেন হরকিশোরবাবু, কিন্তু বই নিয়ে সরাসরি ঘরে ঢোকেন না তিনি।

যে বাসায় তিনি থাকেন, তার সামনে ছোট একটি উঠান। উঠানে আদ্যিকালের একটি আমগাছ। জীর্ণ গাছটিতে ফল ধরে না। বৃদ্ধ বাড়িওয়ালা তারপরও আমগাছটি কাটেন না। বলেন, 'আমার বাবার হাতের আমগাছ। নিজ হাতে লাগিয়েছিল এখানে। ক—ত আম ধরত! ফল দিয়ে দিয়ে বুড়ো হয়েছে।'

BanglaBook.org

কথাপ্রসঙ্গে হরকিশোরবাবু একদিন বলেছিলেন, 'বুড়ো গাছ, জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কেটে ফেলেন না দাদা। জায়গা পরিষ্কার হতো।'

ম্লানমুখে বাড়িওয়ালা নগেনবাবু কিছুক্ষণ হরকিশোরবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তারপর বলেছিলেন, 'অধ্যাপকবাবু, আপনার কাছে এ গাছের কোনো মূল্য না থাকতে পারে, আমার কাছে আছে। আমার বাবার ছোঁয়া লেগে আছে এই গাছে। কাটি কী করে ? ফল না দিক ছায়া তো দিচ্ছে।' নগেনবাবুর বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল। হরকিশোরবাবুকে লক্ষ্য করে আরও বলেছিলেন, 'বুড়ো হলেই সবকিছুকে বিসর্জন দেওয়া যায় কি হরকিশোরবাবু ?'

হরকিশোরবাবু কোনো জবাব না দিয়ে ইতঃস্তত করেছিলেন। নগেনবাবু নিজেই উত্তর দিয়েছিলেন, 'প্রাচীন জিনিস আজকাল সমাজে মূল্য হারাচ্ছে। এই আমার মতো বুড়োদের কথাই ভাবুন না কেন ? যোয়ান ছিলাম, পয়সা কামাতাম। পরিবারে কত দাম ছিল! আর আজ পুরনো টিনের মতো হয়ে গেছি।'

নগেনবাবুর দুই ছেলে। ছেলের বউরা হরদম ঝগড়া করে। ছেলেরাও প্রায়সময় ঝগড়ায় অংশ নেয়। তাঁর ঘরে পরিবেশ বলে কিছুই নেই। মাঝেমধ্যে ঝগড়ার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ান নগেনবাবু। থামাতে চান ঝগড়া। একদিন বড় ছেলে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নগেনবাবুকে বলল, 'বুইজ্যা মানুষ, আমাদের মাঝখানে নাক গলাবে না। যাও এখান থেকে।'

হরকিশোরবাবু সেদিন অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'পুরনো টিনের সঙ্গে বুড়োদের সম্পর্ক কী ?'

'পুরনো টিন জীর্ণ হয়ে যায়। মাঝখানে মাঝখানে মরিচা ধরে। ফুটো হয়ে যায়। ফুটো দিয়ে বৃষ্টি পড়ে বলে চাল থেকে নামিয়ে ফেলা হয় পুরনো টিন। উঠানের একপাশে ফেলে রাখা হয় সেই পুরনো টিন। একদিন পরিবারের কেউ বলে—এই টিনে পা কাটবে বাচ্চাদের। দূরে ফেলে দাও এগুলো। কিন্তু ফেলবে কেন ? ফেলে দেওয়ার চেয়ে ওই টিন দিয়ে কাঁচা টাট্টিখানাটি ঘেরা ভালো। একসময়ের চকচকে নতুন টিনের জায়গা হয় দূরের পুকুরপাড়ের কাঁচা টাট্টিখানায়। আমরা বুড়োরাও পুরনো টিনের মতো। শুধু দূরে ঠেলে দেওয়া! শুধু অপাঙ্‌ক্তেয় হওয়া!' বলে একেবারে চুপ মেরে গিয়েছিলেন সেদিন নগেনবাবু।

হরকিশোরবাবু আর কথা বাড়াবার সাহস করেন নি। কিসের মধ্য থেকে আবার কোন গভীর দুঃখের কথা বেরিয়ে আসে নগেনবাবুর মুখ থেকে।

সেই আমগাছটির গোড়া খুব যত্ন করে বাঁধিয়ে দিয়েছেন নগেনবাবু। বিকেলবেলা সেখানে বসেন। সবার অলক্ষ্যে আমগাছে হাত বুলান।

সেই আমগাছের গোড়ায় বইয়ের প্যাকেটটি রেখে নিস্পৃহ মুখে ঘরে ঢুকেন হরকিশোরবাবু। এদিক-ওদিক তাকান। সুকুমারী রান্নঘর বা বাথরুমে থাকলে, হাঁপ

BanglaBook.org

ছেড়ে বাঁচেন। আমগাছের গোড়া থেকে প্যাকেটটি নিয়ে দ্রুত ঘরে ঢুকেন তিনি। তাকের পুরনো বইয়ের সঙ্গে নতুন কেনা বইগুলো মিশিয়ে দেন।

কোনো কোনো দিন কয়েকটি বই একসঙ্গে পছন্দ হয়ে যায় হরকিশোরবাবুর। সেদিন সব বইয়ের দাম চুকিয়ে একটি মাত্র বই নিয়ে ঘরে ফিরেন। হাতে বই দেখে স্ত্রী হাঁক দেন, 'আবার বই!'

হরকিশোরবাবু কোনোদিন বলেন, 'পুরনো বই। ফুটপাতের দোকানে সস্তায় পেলাম। মাত্র ত্রিশ টাকা।'

বইয়ের প্রতি সুকুমারীর কোনোই আগ্রহ নেই। আগ্রহ থাকলে জানতে পারতেন—আড়াই শ' টাকার বই ত্রিশ টাকায় চালিয়ে দিচ্ছেন হরকিশোরবাবু।

আবার কোনোদিন বলেন, 'পথে শান্তিদার সঙ্গে দেখা। বাসায় গিয়ে এক কাপ চা খাওয়ার জন্যে চাপাচাপি করলেন। পুরনো কলিগ। রিটায়ার করেছেন। বুড়ো মানুষটির আবদার ফেলতে পারলাম না। গেলাম তাঁর বাসায়। বইটি ওঁর কাছ থেকে দু'-চার দিনের জন্যে ধার এনেছি।' বইটা যদি সুকুমারী হাতে নিয়ে পরখ করতেন, দেখতেন বইয়ের ভেতরে কেনার রসিদ এবং আজকের তারিখ লেখা আছে সেই রসিদে।

এইভাবে বছরের পর বছর ধরে নানা চালাকি আর মিথ্যে বোলচালের মধ্য দিয়ে হরকিশোরবাবু বই সংগ্রহ করে গেছেন। সবই যে পড়া হয় এমন নয়। কেনার পর এক লাইনও পড়েন নি—এমন বইও স্তূপিকৃত হয়েছে হরকিশোরবাবুর বাসায়। তারপরও তিনি বই কেনেন। তিনি দুঃখেও বই কেনেন, সুখেও বই কেনেন।

সেবার হরকিশোরবাবু ঠিক করলেন—বেশ্যাদের নিয়ে একটা উপন্যাস লিখবেন। লিখার আগে পড়াশোনা চাই, তথ্য সংগ্রহ করা চাই। এই শহরেই আছে সাহেবপাড়া, মানে পতিতাপল্লি। ওখানকার কাস্টমারদের তিনি খুঁজেপেতে বের করেন, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেন। তারপর নানা প্রশ্ন। নানা তথ্য সংগ্রহ করে করে তিনি সমৃদ্ধ হন। কিন্তু সরজমিনে তথ্যতালাশ দরকার। এজন্য পতিতাপল্লিতে যাওয়া দরকার তাঁর। কিন্তু কী করে যাবেন তিনি? অধ্যাপক মানুষ, শহরের অনেকে তাঁকে চেনে! বুদ্ধি একটা বের করলেন তিনি। কলেজ থেকে পাঁচ দিনের ছুটি নিলেন। ওই পাঁচ দিন দাড়িগোঁফ কাটলেন না। ঘর থেকে বের হলেন না এ পাঁচ দিন। স্ত্রীর হাজারো প্রশ্নের জবাব দিলেন না। ষষ্ঠ দিনের সন্ধেয় পুরনো কাপড়চোপড় পরে স্ত্রীকে আসছি বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন হরকিশোরবাবু। টুপ করে ঢুকে গেলেন পতিতাপল্লিতে। অলিগলি ঘুরলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাস্টমার, বেশ্যা, দালাল, মাসি এদের দেখলেন। গভীর রাতে বোকা বোকা চেহারা করে বাসায় ফিরে এলেন হরকিশোরবাবু।

সে রাতেই 'বাররামা' উপন্যাসের প্রথম প্যারাটি লিখে ফেললেন তিনি।

BanglaBook.org

তাঁর লেখা চলতে লাগল। অধ্যায়ের পর অধ্যায় লিখে যেতে লাগলেন তিনি। এক জায়গায় এসে ঠেকে গেলেন—মানুষের ভেতরে দেহকামনা জাগে কেন ? আদিযুগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত এই দেহকামনার রূপ-রূপান্তর কী ? পরের অধ্যায় লেখার জন্যে এসব তাঁর জানা দরকার। হঠাৎ একদিন 'বাতিঘরে' একটা বই পেয়ে গেলেন হরকিশোরবাবু—'যৌনতার রূপ ও রূপান্তর'। যৌনতা বিষয়ে অসাধারণ একটি বই। বইটির দু'-চার পাতা উল্টানোর পর স্বর্গীয় আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল তাঁর চোখে মুখে। আরে, এই বইটির সন্ধান তিনি আগে পান নি কেন ? বৈদিক যুগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত দেহকামনার কী অসাধারণ তথ্য ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন লেখক এই বইতে! 'বাররামা' লেখার জন্য এই বইটিকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেন তিনি। সাত শ' টাকা দিয়ে তিনি বইটি কিনলেন। বইটি নিয়ে স্বচ্ছন্দে সেদিন বাসাতেও ঢুকতে পেরেছিলেন হরকিশোরবাবু। সেদিন মেয়ে আর জামাই আসবে বলে ভালোমন্দ রান্নায় ব্যস্ত ছিলেন সুকুমারী।

গন্ডগোলটা বাঁধল গভীর রাতে। লেখার টেবিলে বসে বইটি গোগ্রাসে গিলছিলেন হরকিশোরবাবু। মেয়ে আর জামাইকে বিদায় করে রান্নঘরের পাঠ চুকাতে চুকাতে সুকুমারীর বেশ দেরিই হয়ে গিয়েছিল সেরাতে।

কখন স্ত্রী পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, টের পান নি হরকিশোরবাবু। এক ঝটকায় বইটি কেড়ে নিয়ে সুকুমারী চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'ছেঃ ছেঃ ছেঃ! কী পড়ছ তুমি ? হ্যাঁ, কী পড়ছ ? বুড়ো বয়সে একি পড়ছ তুমি ?' প্রচ্ছদের প্রায় নগ্ন দু'জন নরনারীর রেখাচিত্রের ওপর থুতু ছিটিয়ে সুকুমারী আরও বললেন, 'ঝেঁটা মারি এই বইয়ে।' তারপর ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি, 'নরকে যাবে তুমি। হায় ভগবান, আমার কী হবে গো!'

স্তম্ভিত চোখে হরকিশোরবাবু সেরাতে সুকুমারীর দিকে শুধু তাকিয়ে ছিলেন। কোনো উত্তর দেওয়ার তাগিদ বোধ করেন নি। ভেবেছেন—চোখের সামনে একসময়ের অসাধারণ একজন তরতাজা প্রাণবান তরুণী কীরকমভাবে ধীরে ধীরে সাধারণ পর্যায়ে নেমে এল! একটা চকচকে সোনার হার চোখের সামনে গিল্টিহারে রূপান্তরিত হলো সময়ান্তরে!

এরকম নানা যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে হরকিশোরবাবু লিখে যান। গত কয়েক বছরে তিনি জেলেদের নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন, পতিতাদের নিয়ে লিখেছেন, লিখেছেন মেথরদের নিয়ে উপন্যাস। ব্রাত্যজনের লেখক বলে পাঠকসমাজে একটু-আধটু কদরও বেড়েছে হরকিশোরবাবুর।

সেই সুবাদে নানা সাহিত্যসভায় হরকিশোরবাবুর ডাক পড়ে।

যা ভাবেন তিনি, যা বোঝেন—বলে যান সেইসব সভাতে। সেবার এক সাহিত্যসভায় ডাকা হলো তাঁকে। সেদিনের আলোচনার বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকে পাশ্চাত্য প্রভাব। এক অধ্যাপক খুব ঘেঁটেঘুঁটে প্রবন্ধ লিখেছেন।

BanglaBook.org

নানা তথ্য উপাত্ত দিয়ে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন 'ডাকঘর' নাটকে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক প্রতিভার কোনো চিহ্ন নেই। জার্মান কবি গ্যেটের কাছ থেকে ধার করা কাহিনি সাজিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ 'ডাকঘরে'। আলোচকেরা তাইরে নাইরে করে বক্তৃতা শেষ করলেন। তাঁরা প্রখ্যাত প্রাবন্ধিককে ঘাঁটাতে চান নি। আলোচনা থেকে শ্রোতারা কোনোভাবেই বুঝতে পারলেন না 'ডাকঘর' মৌলিক না কৃত্রিম।

হরকিশোরবাবুর পালা এল। তিনি নানা উদাহরণ কোটেশনের মাধ্যমে প্রমাণ করলেন—প্রাবন্ধিক যতই রবীন্দ্রনাথকে ছোট করতে চান না কেন, 'ডাকঘরে' রবীন্দ্রনাথ অনন্য এবং মৌলিক। বক্তৃতা শেষে হাততালি পড়ল বেশ।

সভা শেষে এক মধ্যবয়সী মহিলা এগিয়ে এলেন হরকিশোরবাবুর দিকে। মায়াময় চেহারা। চোখে শান্তস্নিগ্ধ সরোবরের ছায়া। কোনো ভূমিকা ছাড়া মহিলা বললেন, 'আমি আপনার লেখা পছন্দ করি। শুধু আমি না, আমাদের পরিবারের অনেকেই আপনার উপন্যাস পড়ে। এমনকি আমার মাও।'

মহিলার পরিচয় হরকিশোরবাবু জানেন না। মহিলার দিকে স্মিত চোখে তাকিয়ে থাকেন।

পাশের একজন নিচুস্বরে বললেন, 'কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদের বোন স্যার, সুফিয়া খাতুন।'

হরকিশোরবাবু এবার হকচকিয়ে গেলেন। তিনি কিছু একটা বলতে চাইলেন, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরোল না তাঁর। মৃদু গোঁ গোঁ একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল শুধু তাঁর মুখ থেকে।

বেশ কিছুক্ষণ পর একটু আত্মস্থ হলেন হরকিশোরবাবু। বললেন, 'আদাব।'

সুফিয়া খাতুন বললেন, 'আদাব হরকিশোরবাবু। আমি যা বলেছি মিথ্যে বলিনি। সত্যি আপনি আমাদের পরিবারের অত্যন্ত প্রিয় লেখক। তবে আপনার বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত একটা অভিযোগ আছে।'

'অভিযোগ!' অবাক চোখে জিজ্ঞেস করলেন হরকিশোরবাবু।

'হ্যাঁ, আপনি বৃত্তাবদ্ধ হয়ে গেছেন।'

'মানে!'

'মানে আপনি শুধু প্রান্তমানুষজন নিয়ে লেখেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন নিয়ে লেখেন না কেন?'

'আমি যে দিদি ওই ব্রাত্যজনগোষ্ঠীকেই ভালো করে চিনি। অভিজ্ঞতার বাইরের লেখা যে জলো হয় সেটা তো আপনি জানেন! আধুনিককালের মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনযাপন চিত্র যে আমার অভিজ্ঞতার বাইরে।' হরকিশোরবাবু বললেন।

স্পষ্টভাষী সুফিয়া খাতুন বললেন, 'সত্য নয় আপনার কথা। ওই শ্রেণির মধ্যেই তো আপনার বর্তমান জীবনযাপন। ওদের চেনেন না বললে আমরা মানব কেন? যাই

BanglaBook.org

হোক, মধ্যবিত্তজীবন নিয়ে আপনার কাছে একটা উপন্যাস চাই। আপনার ধারণাটা যে ভুল, অন্তত সেটা প্রমাণ করার জন্যে হলেও আপনি একটা উপন্যাস লিখুন।'

সুফিয়া খাতুনের দাবিতেই হরকিশোরবাবু নতুন একটা উপন্যাসে হাত দিলেন। সাধারণত উপন্যাস লেখা সম্পূর্ণ করার পর তিনি উপন্যাসের নাম দেন। কিন্তু এই উপন্যাসটি লেখার আগেই তিনি নাম ঠিক করে ফেললেন—'হৃদয়নদী।'

সুফিয়া খাতুনের সেদিনের অভিযোগে হরকিশোরবাবুর ভেতরে একধরনের আগ্রহের সৃষ্টি হয়। এই আগ্রহ দুর্বার হলো একসময়। সেই দুর্বার আগ্রহের প্রভাবে হরকিশোরবাবু 'হৃদয়নদী' লিখে যান। ভোরসকালে উঠে লিখা শুরু করেন। কলেজের সময় পেরিয়ে যায়, হরকিশোরবাবুর কলম থামে না। স্ত্রী তাগাদা দেন, কলেজে যাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেন। সন্ধেয় মুড়ি-বিস্কুট আর এক কাপ চা খেয়ে লেখা শুরু করেন। স্ত্রীর উপর্যুপরি তাগাদায় রাতের খাবার খেতে বসেন। নাকে মুখে দু'চার গ্রাস গুঁজে দিয়ে লেখার টেবিলে ফিরে আসেন। লিখতে লিখতে গভীর রাত হয়ে যায়। স্ত্রী বিছানায় শুয়ে বাতি নেভাবার তাগাদা দেন। কে শুনে কার কথা! স্ত্রীর ঘ্যানরঘ্যানরকে কানের বাইরে রেখে অবিরাম লিখে যান তিনি।

সেরাতে 'ধুত্তুরি ছাই' বলে হঠাৎ গর্জে উঠলেন হরকিশোরবাবু। স্ত্রী রোষকষায়িত নেত্রে এগিয়ে এলেন পড়ার টেবিলের কাছে। 'কী হয়েছে ? এরকম চেঁচিয়ে উঠলে কেন ? কী দোষ করলাম যে এরকম চেঁচালে ?' সুকুমারী কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

'আরে দেখছ না, বুকসেল্‌ফ থেকে হর হর করে ঘুণ পড়ে গোটা টেবিলটা বরবাদ করে দিল!' তারপর আস্তে করে বললেন, 'আমার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে তোমাকে ঘাঁটাই!'

এ কথায় সুকুমারী বড় তৃপ্তি পেলেন। হঠাৎ মোলায়েম কণ্ঠে সুকুমারী বললেন, 'তোমাকে অনেক আগে থেকে বলছি, পড়ার টেবিলের পাশে এই সেল্‌ফটি পাল্টাও। শুনছ না তুমি। গাদা গাদা বই রেখে ভারী করে তুলেছ সেল্‌ফটিকে। দেখো, কোনো একদিন খুলে পড়ে কী বিষাদ না ঘটায়! এখন লেখা থামাও। রাত অনেক হলো। ঘুমাতে চলো।'

হরকিশোরবাবুর মনটাও কেন জানি হঠাৎ করে নরম হয়ে গেল। স্মিত চোখে সুকুমারীর দিকে তাকালেন তিনি। নিবিড় চোখে কিছুক্ষণ সুকুমারীর দিকে তাকিয়ে থাকার পর হরকিশোরবাবু বললেন, 'মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে একটা উপন্যাস লিখা শুরু করেছি বেশ কিছুদিন আগে। আজকে শেষ পরিচ্ছেদ লিখছি। আর মিনিট বিশেক লিখলে উপন্যাসটি শেষ হবে। তুমি যাও। এই আমি আসছি বলে।'

সে-রাতে সুকুমারীর কী হলো কে জানে। হঠাৎ হরকিশোরবাবুর হাত চেপে ধরলেন তিনি। কোমলকণ্ঠে বললেন, 'এখন আর লিখতে হবে না। চলো ঘুমাতে। ভোরে উঠে লিখো।'

BanglaBook.org

হরকিশোরবাবুর দেহের ভেতরে কী রকম যেন একটা শিহরণ তোলপাড় করে উঠল। লেখা বন্ধ করলেন তিনি। সুকুমারীকে বললেন, 'তুমি বিছানায় যাও, আমি বাথরুম থেকে আসছি।'

পরদিন ভোরে উঠে লিখতে বসলেন হরকিশোরবাবু। সুকুমারী তখনো নিদ্রিত। প্যারার পর প্যারা লিখে যাচ্ছেন তিনি। এত দিন তিনি শুধু প্রান্তিক মানুষদের সমাজ ও জীবন নিয়ে লিখে গেছেন। এখন লিখছেন মধ্যবিত্তজীবনের নানা টানাপড়েন নিয়ে। হঠাৎ তার ভেতরে অনুশোচনার এক আলোড়ন উঠল—আরে, এত দিন মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে লিখেন নি কেন তিনি! ভাগ্যিস, সুফিয়াদি তাঁকে সচেতন করেছিলেন, নইলে 'হৃদয়নদী' লেখা হতো না। আর মাত্র দুটো প্যারা, তারপর মুক্তি। 'হৃদয়নদী' লেখা সম্পন্ন হবে আর মাত্র দুটো প্যারা লিখলে। আঃ, কী শান্তি! হরকিশোরবাবু ভাবছেন আর লিখছেন।

এমন সময় হুড়মুড় করে পাশের বুকসেল্‌ফটি ভেঙে পড়ল হরকিশোরবাবুর মাথায়। বুকসেল্‌ফটি দেয়াল থেকে একা নেমে এল না, সঙ্গে নিয়ে এল সিলিং ফ্যান আর পাশের টেবিল ল্যাম্পকে। ফ্যানের একটি ব্লেড দ্রুতবেগে নেমে এল হরকিশোরবাবুর মাথা বরাবর। গলগলিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল মাথা থেকে। বইয়ের স্তূপের নিচে চাপা পড়ে গেলেন হরকিশোরবাবু।

আজ মাসিক শ্রাদ্ধ চুকে গেল হরকিশোরবাবুর।

সুকুমারী ফেরিওয়ালাকে ডেকে এনেছেন। অম্লানকুসুমকে বললেন, 'ঘরের সমস্ত বই সের দরে বিক্রি করে দাও অম্লান।' তারপর ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বইগুলো দেখিয়ে তাচ্ছিল্যের স্বরে সুকুমারী আরও বললেন, 'যত তাড়াতাড়ি পার ঘর থেকে এইসব ছাইপাঁশ আবর্জনা ঝেঁটিয়ে বের করো।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দেহ

আমার এ কাহিনির মধ্যে ছিটেফোঁটা মিথ্যে নেই। যা বলিব সত্য বলিব ধরনের কাহিনি এটি। যাঁদের ঘরে বউ আছে, সেই বউ তরুণী বা বুড়ি, তাঁরা আমার এ গল্পের মর্মার্থ বুঝবেন না। যাঁরা প্রৌঢ় বয়সে বউ হারিয়েছেন, রাগে অথবা অন্যের প্রতি অনুরাগে যাঁদের বউ ঘর ছেড়েছে, তাঁরাই বুঝবেন আমার এ গল্পের সারার্থ। যে বিপত্নীকের দু'-একটা সোমত্ত সন্তান আছে ঘরে এবং তাদের চোখ রাঙানিতে নতুন করে বিয়ে করতে পারছেন না অথচ রাতবিরাতে শরীরে আরেকটা শরীরের জন্যে প্রবল আকুতি জাগে, শুধু তাঁরাই আমার এ গল্পের যথার্থ পাঠক বলে আমি মনে করি। তাঁদের জন্যেই আমার এই কাহিনি বলা। অন্যরা এই গল্প না পড়লেও চলবে ।

লেখকেরা হন্যে হয়ে কাহিনি খুঁজে বেড়ান। এর ওর কাছ থেকে তাদের জীবনের কাহিনি শোনেন, সেই কাহিনির সঙ্গে নিজ জীবনাভিজ্ঞতার মিশেল দিয়ে গল্প ফাঁদেন। আমার এ গল্পের ক্ষেত্রে কিন্তু এই নিয়ম খাটে না। এটা ধার করা কোনো কাহিনি নয়। একেবারে নিরেট সত্যকাহিনি। একটু ঝেড়ে কাশি আপনাদের সামনে। সত্যি বলতে কি, এটা আমার জীবনেরই কাহিনি। এত দিন পর্যন্ত নানা কৌশল অবলম্বন করে পরের কাহিনি শুনিয়ে গেছি আপনাদের। এবার ঠিক করলাম—আর ফাঁকিঝুঁকি নয়, নিজের জীবনের সত্য ঘটনাই শোনাব আপনাদের। তাতে পাঠকের কী লাভ হবে জানি না। আমার লাভ হবে এটা যে, আমার ভেতরে লুকিয়ে থাকা একটা দুর্মর দুর্দমনীয় বাসনাকে আপনাদের সামনে খুলে মেলে ধরতে পেরে এত দিনের জগদ্দল পাথরের চাপ থেকে মুক্তি পাব আমি।

এ কাহিনি আমার, সুতরাং নায়কও আমি এ গল্পের।

বাবা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। জীবনের শেষদিকেই খুঁটাখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক হয়েছিলেন তিনি। আমাদের গাঁয়ের নামটি বড় অদ্ভুত—কাউয়ার দ্বীপ। কাউয়া মানে কাক। বাবাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম—আমাদের গাঁয়ের নাম এত অদ্ভুত কেন ? বিএসসি পাস হলেও ইতিহাসের দিকে ঝোঁক ছিল বাবার। তিনিই বলেছিলেন—ওই যে দূরে বাঁকখালি নামের ছোট্ট নদীটি বয়ে যাচ্ছে, ওটি একসময় আমাদের গাঁ ঘেঁষে বয়ে যেত। ওই নদীরই পলি দিয়ে কাউয়ার দ্বীপ তৈরি। প্রথম দিকে এখানে কোনো জনমানুষ ছিল না। কী এক অজানা কারণে শত শত কাক এসে একসময় এখানে আশ্রয় নিতে শুরু করল। খাবারের খোঁজে সকালের দিকে বাইরে গেলেও সন্ধে নাগাদ অজস্র কাক এসে এখানে জড়ো হতো। মানুষের মুখে মুখে এ জায়গার নাম হয়ে গেল—কাউয়ার দ্বীপ। তারপর দু'- এক ঘর করে মানুষ আসতে লাগল এখানে। একটা সময়ে জনবসতি গড়ে উঠল এই কাউয়ার দ্বীপে।

BanglaBook.org

আমার বাবা একটু কাঠখোট্টা টাইপের লোক ছিলেন। সাপকে সাপ আর দড়িকে দড়ি বলতেন। কারও চাপে দড়িকে সাপ বলতে এবং মানতে রাজি হতেন না তিনি। একদিন এক স্কুলপরিদর্শক এলেন স্কুলে। প্রধানশিক্ষক ছিলেন না সেদিন, বাবাই দায়িত্বে ছিলেন। ছোকরা বয়সের পরিদর্শক স্কুল ঘুরে ভারিক্কি চালে প্রধানশিক্ষকের চেয়ারে বসলেন। চা পানি খেলেন। যাওয়ার সময় টাকা দাবি করে বসলেন বাবার কাছে। বাবা বেঁকে বসলেন—টাকা দেবেন কোত্থেকে তিনি ? চাপাচাপি করলে চাঁছাছোলা ভাষায় বললেন, 'এত চ্যাংড়া বয়সে ঘুষ খাওয়া শিখে ফেলেছেন ?'

পরিদর্শক কটমট করে তাকিয়ে থেকেছিলেন বাবার দিকে। তারপর প্রধানশিক্ষকের রুম থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ফল কিন্তু ভালো হয় নি। তাঁর রোষানলে পড়ে বাবা দীর্ঘ দীর্ঘদিন পরে প্রধানশিক্ষক হতে পেরেছিলেন।

তো আমার বাবা অন্য জায়গায় কাঠখোট্টা হলেও মায়ের সামনে কিন্তু বেশ নরম-শরম থাকতেন। বাবা মাকে বেশ সমীহ করে চলতেন। এই সমীহ ভালোবাসা কি না ছোটবেলায় বুঝতে পারি নি। বাবা মাকে ভালোই বাসতেন, নইলে কেন মায়ের সকল আবদার মিটাতে তিনি কোনোদিন কার্পণ্য করেন নি। বাবার পাঁচ ছেলেমেয়ে। মাকে বাবার নিবিড়ভাবে ভালোবাসারই ফসল আমরা। অভাবের মধ্যেই বড় হয়ে ওঠা আমাদের। আমরা ছিলাম দত্ত। বাবা প্রায়সময় মাইকেল মধুসূদন আওড়াতেন। বলতেন, দত্ত কারও ভৃত্য নয়। বাবার খুব বর্ণগরিমা ছিল। তো এই দত্তপরিবারের প্রথম সন্তান প্রাইমারি স্কুলের পর হাইস্কুলে গেলাম। আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় মাইল দুয়েক দূরে ছিল হাইস্কুলটি। নাইনে পড়ার সময়ে একদিন একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা হলো পথে। পরে জেনেছি সুরমা নাম তার। আমার চেয়ে দু'-চার-ছয় মাসের বড় হবে না ছোট হবে বুঝতে পারি নি সেদিন। কালাকোলা। মাঝারি হাইটের সুরমা লম্বা বেণী দুলিয়ে বুকে বই চেপে গার্লস স্কুল থেকে আসছিল সেদিন। সেদিন কেন জানি সুরমার মায়াময় চোখে আমার দু' চোখ আটকে থেকেছিল কয়েক সেকেন্ড।

আমাদের বাড়ি ছাড়িয়ে আরও বেশটুকু এগিয়ে গেলে দাশপাড়া। দাশ মানে জলদাস না, হিন্দু দাশ। দাশদের আবার বর্ণহিন্দুরা হেয় চোখে দেখে। বলে—ছোটজাত। ওই দাশপাড়ার সুনীল দাশের মেয়ের কাছে দত্তবাড়ির প্রফুল্ল দত্ত তার হৃদয়টি জমা রাখল। সুরমার স্কুল আর আমার স্কুল ঢিলছোড়া দূরত্বে। হলে কি হবে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলার সুযোগ ও সাহস ছিল না আমাদের। শুধু আসা-যাওয়ার পথে মুখোমুখি হলে একটু থমকে দাঁড়ানো বা মুচকি হাসির চিকচিকে চোখে ক্ষণিক তাকানো। এবং আড়ালে-আবডালে একটা দুটো কথা বলা। এরকম চলতে চলতে বছর খানেক কেটে গেল। দুজনেই এসএসসি দেওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম।

একদিন ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ এল আমাদের হাতে। সেটা আমার দুঃসাহসের জন্যে সম্ভব হয়েছিল। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরবার পথে সে জানিয়েছিল—আজ বাবা-মা থাকবে না ঘরে। ছোট ভাইটিকে নিয়ে মামাবাড়িতে কার যেন বিয়েতে

BanglaBook.org

যাবে। শুধু দিদিমা থাকবে ঘরে। সুরমা এই তথ্যটি আমাকে কেন দিয়েছিল, ঠিক ওই সময় বুঝি নি। সন্ধে লাগো লাগো সময়ে হঠাৎ আমার খেয়াল হলো – আরে, সুরমা নির্জনতার সংবাদ দিয়ে কি আমার সান্নিধ্য কামনা করেছে ? সুরমা যা-ই কামনা করুক, আমি কিন্তু সান্নিধ্যই কামনা করলাম। চেয়ার পেতে দরজায় বসে থাকা বাবাকে বললাম, 'বাবা বন্ধুর বাড়িতে যাব, তার কাছ থেকে ইমপর্টেন্ট নোট আনতে হবে।'

বাবা তৎক্ষণাৎ রাজি হলেন। এই বাড়ির প্রথম সন্তান এসএসসি দিচ্ছে, তার কথার গুরুত্ব তো দিতেই হবে।

গুরুত্বপূর্ণ আমি আঁধারলাগা সন্ধেয় হাজির হলাম সুরমাদের উঠানে। সুরমাদের বাড়িটা একটেরে। উঠান থেকে শুকাতে দেওয়া শাড়ি তুলছিল সে। আমাকে দেখে বিস্মিত হলো বলে মনে হলো না। একটু যেন উল্লসিত হলো সে। খপ করে আমার ডান হাতটা ধরে পাশের গোয়ালঘরে ঢুকে পড়ল সে। বলল, 'তুমি এখানে একটু দাঁড়াও। দিদিমাকে বুঝ দিয়ে আসি।' বলেই সে ছুট করে বেরিয়ে গেল।

পিট পিট করে আঁধারে চোখ সইয়ে নিলাম। আবছাভাবে দেখলাম, দুটো গরু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাবর কাটছে আর প্রবল বেগে লেজ নেড়ে যাচ্ছে এদিক থেকে ওদিকে, আর ওদিক থেকে এদিকে। আর লেফট রাইট করে যাচ্ছে দ্রুত তালে। মুহূর্তেই আমি টের পেলাম আমার পায়ে মশারা হামলে পড়েছে। মশার হুল থেকে বাঁচবার জন্যে গরু দুটোর পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে আমিও লেফট রাইট শুরু করলাম। এককভাবে ডান বাম করার আওয়াজ আবার দিদিমার কানে পৌঁছালে তো লঙ্কাকাণ্ড অনিবার্য। এরপর টের পেলাম গোমূত্রের বোঁটকা গন্ধ। শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার একটু আগে সুরমা এসে উপস্থিত হলো গোয়ালঘরে।

সেই আমার প্রথম নারীসান্নিধ্য। পাঠকেরা ভুল বুঝবেন না। নারীসান্নিধ্য মানে নিবিড়ভাবে বুকে জড়িয়ে ধরা। চুমো দেওয়া শিখি নি তখনো। সুরমাই ঝট করে তার ঠোঁট নামিয়ে এনেছিল আমার ঠোঁটের ওপর। সেই-ই আমার জীবনে প্রথম চুমো খাওয়া। ও হ্যাঁ, আর একটা কাজ করেছিলাম আমি, সেটা না বললে পাপ হবে আমার। ওই যে বলেছি, যা বলিব সত্য বলিব। আমি সেই সন্ধেয় গভীর গহিন নিবিড়তার মধ্যে সুরমার বুকে হাত দিয়েছিলাম। স্তন আমার কাছে নারীদেহের সবচাইতে আকর্ষণীয় অঙ্গ বলে বিবেচিত। সেই কিশোর বয়সে যেমন, এই ষাটোর্ধ্ব বয়সেও তেমনি। আমার ধারণা ছিল—নারীস্তন তুলতুলে তুলোর মতন। কিন্তু সুরমার স্তনে হাত দেওয়ার পর বুঝলাম—আমার ধারণা মিথ্যে। ঝুনা নারকেলের মালার দুটো অংশ উপুড় করে বসানো যেন সুরমার বুকে। এই-ই ছিল আমাদের প্রথম প্রেম, মানে প্রথম দেহপ্রেম।

গোয়ালঘর ত্যাগ করার আগে সুরমাকে বলেছিলাম, 'বিয়ে করলে তোমাকেই করব, অন্য কাউকে নয়।'

Banglabook.org

বিয়ে আমি সুরমাকেই করেছিলাম, তবে বাবার সকল ভালোবাসার বিনিময়ে। চট্টগ্রাম কলেজ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করেছি। ভাইদের মধ্যে একজন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, অন্যজন কলেজে। বোনদের বিয়ে হয়ে গেছে। বাবা রিটায়ার করেছেন। সালামত উল্লাহ্ কলেজে লেকচারের চাকরিও পেয়ে গেছি আমি। মায়ের চাপাচাপিতে বাবা একদিন বললেন, 'প্রফুল্ল, তুমি এমএ পাস করেছ, চাকরি করছ। এখন তোমার বিয়ে হওয়া দরকার। আমরা মেয়ে দেখি, কী বল ?'

সেদিন আমার কী হয়েছিল কে জানে! যমের মতো ভয়জাগানিয়া বাবার সামনে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট গলায় বলেছিলাম, 'বিয়ে করাতে চাইলে আমার আপত্তি নেই। তবে আমার একজন পছন্দের আছে।' ভেবেছি—ছোটবেলার আমি আর বড়বেলার আমির মধ্যে পার্থক্য আছে। এখন আমি অধ্যাপনা করি। বাবাকে অহেতুক ভয় করা এখন আমার যেমন উচিত নয়, তেমনি আমার ঢাকঢাক গুড়গুড় করাও চলে না।

জলদগম্ভীর কণ্ঠে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'পছন্দের আছে ? কে ?'

মাও অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

আমি কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বললাম, 'সুরমা তার নাম। দাশপাড়ার সুনীল দাশের মেয়ে সুরমা দাশকে বিয়ে করব আমি।' তারপর একটু থেমে আরও বললাম, 'যদি আমাকে বিয়ে করতে হয়।'

কেউ কথা বলছেন না শুনে কড়িকাঠ থেকে বাবার দিকে চোখ নামালাম। দেখলাম—বাবার চোখ দুটো কোটর ছেড়ে অনেকাংশে বেরিয়ে এসেছে। স্তব্ধ, স্তম্ভিত, হতবাক, হতভম্ব—এ জাতীয় যতগুলো শব্দ আছে তার সবগুলোই বাবার এই মুহূর্তের চেহারার জন্যে প্রযোজ্য।

'কী ? কী বললে তুমি ? দাশের মেয়েকে বিয়ে করবে তুমি ? দত্তবাড়ির ছেলে বিয়ে করবে দাশের মেয়েকে ?' প্রলম্বিত লয়ে প্রতিটি শব্দের প্রথম বর্ণে শ্বাসাঘাত করে কথাগুলো বলে গেলেন সাগরচন্দ্র দত্ত মশাই।

মাকে খুব বিচলিত দেখলাম এই সময়। মায়ের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ বাবা, দাশের মেয়েকেই বিয়ে করব আমি। কথা দিয়েছি তাকে।'

'যদি আমরা রাজি না হই এ বিয়েতে।' মা বললেন।

আমি বললাম, 'মা, আমি বড় হয়েছি। ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলাম, এখন অধ্যাপনা করছি। উচ্চবর্গীয় ঘোরের মধ্যে আর থেকো না। তোমরা যা-ই বলো আর যা-ই করো, সুরমাকেই বিয়ে করব আমি।'

এরপর বাবা রাগে ফেটে পড়লেন। তাঁর সংস্কার, তাঁর শিক্ষা, আমার বড় হওয়া, আমার বাসনা—সবকিছুকে ভুলে তিনি মুখে যা এল তা-ই বললেন। আমি চুপ করে শুনে গেলাম সব।

BanglaBook.org

আমি কথা বলছি না দেখে তিনি কঠোর কণ্ঠে বললেন, 'এই বিয়ে আমি মেনে নেব না। প্রয়োজনবোধে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হবে।'

আমি কণ্ঠে দৃঢ়তা ঢেলে বললাম, 'তা-ই হবে বাবা।' বলে মা-বাবার সামনে থেকে সরে পড়লাম।

ওই সময় 'আমার তা-ই হবে'র মর্মার্থ বুঝতে পারেন নি আমার মা-বাবা। বুঝেছেন ছয় মাস পরে।

চাকরিসূত্রে এমনিতেই আমি চট্টগ্রাম শহরে বাসা নিয়েছিলাম। সুরমা বিএ পাস করে তখন বাপের বাড়িতে। দরিদ্র বাবা তাকে বিয়ের জন্যে পীড়াপীড়ি করছেন। কালো মেয়ের এমনিতেই বর জোটে না। অনেক কষ্টে বাপ এক স্কুলমাস্টারকে রাজি করিয়েছেন সুরমাকে বিয়ে করার জন্যে। কিন্তু সুরমা সাফ জানিয়ে দিয়েছে—বিয়ে সে প্রফুল্ল দত্তকেই করবে।

একদিন আমাদের বিয়ে হয়ে গেল, চট্টেশ্বরী মন্দিরেই আমাদের বিয়ে হলো। কাউয়ার দ্বীপ থেকে সুরমা একা চট্টগ্রাম শহরে এসে পৌঁছেছিল বিয়ের এক দিন আগে।

আমাদের নতুন জীবন শুরু হলো। ছোট্ট দুই রুমের বাসাতে আমরা দাম্পত্যজীবন শুরু করলাম। এ জীবন অম্ল-মধুরে ভরা। বাবা নাকি বলে বেড়াচ্ছেন—প্রফুল্ল ছাড়াও আমার অন্য ছেলে আছে। তারাই আমার বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। প্রফুল্ল কুলাঙ্গার, আমার কেউ না। তোমরা তাকে বলে দিয়ো—ওই নষ্টটা যাতে আর আমার বাড়িতে না আসে।

আমার বাড়ি যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে মা বাবা আর ভাইবোনদের জন্যে বুকটা কেঁপে উঠত। আমার বিচলিত অবস্থা দেখে সুরমা বলত, 'তুমি আফসোস কোরো না। দেখে নিয়ো একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।' বলতে বলতে সে আমার ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াত, বুকে গালে হাত বুলাত।

বেশ কয়েকটি বছর কেটে গেল এইভাবে। আমার সংসার বাড়ল, সম্পদ বাড়ল।

দুটো সন্তান জন্মাল আমার। ছেলে কৌশিক, মেয়ে সুব্রতা। টাকা জমিয়ে জমিয়ে হেমসেন লেইনের খালের ধারের তিন গণ্ডা জলো জায়গাও কিনলাম। সুরমার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি হলো। দুজনের টাকা দিয়ে ইট কিনলাম, সিমেন্ট কিনলাম, রড কিনলাম। দশ বছরের সাধনায় আমাদের কেনা জায়গার ওপর বাড়ি উঠল। বাড়ির নাম দিলাম—'প্রচেষ্টা'। আরও ক'বছর পর 'প্রচেষ্টা' একতলা থেকে দোতলা হলো।

ও, বলতে ভুলে গেছি, এর মধ্যে আমার কলেজ সরকারি হলো। সেই সুবাদে আমিও সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক হয়ে গেলাম।

ছেলেমেয়ে স্কুলে যায়, স্ত্রী চাকরি করে, আর আমি অধ্যাপনা। সুখের জীবন। এ জীবনে আরেকটা সুখ যুক্ত হলো—ব্যাকরণ বই লেখা। বাংলাবাজারের এক প্রকাশক এসে ধরনা দিল—স্যার, একটা ব্যাকরণ বই লিখে দেন, ক্লাস সেভেনের জন্য।

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'আমি কী ব্যাকরণ বই লিখব ? অনেক বই তো বাজারে। সব বইতে তো একই কথা। আমি লিখলে তো ওই ণত্ব-বিধান, ষত্ব-বিধান, পদ কয় প্রকার, একটি পূর্ণ বাক্যের কী কী বৈশিষ্ট্য—এসব কিছু, অন্যে যা লিখেছে তা-ই তো লিখব। ব্যাকরণের নতুন কিছু তো আবিষ্কৃত হয় নি! না ভাই, ওসব আমাকে দিয়ে হবে না।' প্রকাশক কিন্তু নাছোড়বান্দা। আমি বেশ ক'বার তাইরে নাইরে করে শেষ পর্যন্ত রাজি হলাম। লিখলাম একটা ব্যাকরণ বই। লিখলাম মানে কী ? এঁর বই থেকে এ অংশ, ওঁর বই থেকে ও অংশ এবং নিজে কিছু নতুন উদাহরণ দিয়ে লিখলাম আর কী।

কী আশ্চর্য, বইটি পড়ুয়ারা নিল। হই হই রই রই করে বিক্রি হলো ব্যাকরণ বইটি। প্রকাশক আমাকে বঞ্চিত করল না। টাকা দিল অনেক। আমার ঘরে প্রাচুর্য এল। বাচ্চাদের নতুন নতুন জামা কেনা হলো। স্ত্রীর গায়ে নতুন নতুন শাড়ি উঠল। আমার স্ত্রী কালো বলে প্রসাধন সামগ্রীর দিকে প্রবল ঝোঁক। ইচ্ছেমতন ওসব কিনতে পেরে খুশিতে আটখানা হলো সে।

নিজের বাড়িতে থাকি। আমি আর আমার স্ত্রীর বেতনে সংসার চলে স্বচ্ছন্দে। সন্তানেরা প্রাইমারি থেকে হাই, হাই থেকে কলেজে যায়। সহকর্মীরা বলে—সুখী পরিবার। দাদা, আপনার মতো সুখী মানুষ এই দীনদুনিয়ায় আর নাই। ওরা যা-ই বলুক, আমি জানি আমার মতো দুঃখী মানুষ খুব কমই আছে এই পৃথিবীতে। মা-বাবা পরিত্যক্ত আমি। কোনো অপরাধ না করেই দীর্ঘদিন ধরে গুরুদণ্ড ভোগ করে যাচ্ছি। শুধুমাত্র নিচু বংশের মেয়েকে বিয়ে করার কারণে আমার দত্ত বাবা আমাকে ত্যাজ্য করেছেন।

আমার বাহ্যিক সুখের খবর, আমার ঐশ্বর্যের সংবাদ বাবার কাছে যায়। বাবা নির্লিপ্ত থাকেন। দিনে হলে কড়িকাঠ দেখেন, রাতে হলে তারা গুণেন। সংবাদবাহকেরা তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে, তিনি কোনো কথা বলেন না। চেহারায় কঠোরতা ঢেলে অন্য কাজে মনোনিবেশ করেন। আমার সন্তান-জন্মের খবর যেদিন তাঁর কাছে পৌঁছায়, সেদিন নাকি তিনি একটু বিচলিত হয়েছিলেন। কৌশিকের জন্মের খবর পেয়ে তাঁর চেহারা নাকি আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। 'কই, কই গেলা' বলে মাকে ডেকেছিলেন। মা কাছে এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কেন ডাকলে ? হেঁশেলে কাজ করছিলাম।'

ইতোমধ্যে বাবা তাঁর ভেতরের উচ্ছ্বাসকে গলা টিপে হত্যা করে ফেলেছেন। অনুরাগকে দাবিয়ে রাগ তখন তার চোখে মুখে টগবগ করছে। মায়ের প্রশ্নের জবাবে বাবা নির্লিপ্ত গলায় বলেছিলেন, 'না, এমনিতেই তোমাকে ডাকলাম। সকাল থেকে তোমাকে দেখছি না তো!'

মা মুচকি হেসে রান্নাঘরে ঢুকেছিলেন।

আমার সেই বর্ণবাদী, একরোখা, নির্মম বাবা শেষ পর্যন্ত একদিন আমাকে খবর পাঠিয়েছিলেন।

BanglaBook.org

পাড়াতো কাকার মুখে 'তোমার বাবা পাঠিয়েছেন আমাকে' কথাটি শুনে আমার কলিজা লাফিয়ে উঠেছিল সেদিন। আনন্দেও যে মানুষ বিহ্বল হয়ে পড়ে সেদিনই আমি বুঝেছিলাম। কিছুক্ষণ পর বিহ্বলতা কাটিয়ে আগ্রহভরে কাকাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেন কাকা, বাবা কেন পাঠিয়েছেন আপনাকে ?'

কাকা বলেছিলেন, 'তোমার মায়ের খুব অসুখ, বাঁচামরার ব্যারাম।'

আসলে মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। স্থানীয় ডাক্তাররা ব্যর্থ হলে গঞ্জের বড় ডাক্তারের কাছে মাকে নিয়ে গিয়েছিলেন বাবা। দীর্ঘদিন চিকিৎসার পরও মা ভালো হলেন না। বাবা দিনরাত মায়ের শয্যার পাশে পড়ে থাকলেন। তাঁর নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তিনি মায়ের মাথায় শুধু হাত বুলান আর বলেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে প্রফুল্লর মা, তুমি ভালো হয়ে উঠবে।'

ম্রিয়মাণ মা ম্লান কণ্ঠে একদিন বাবাকে বললেন, 'তুমি প্রফুল্লকে খবর দাও। মরার আগে আমি আমার বড় ছেলেকে দেখে যেতে চাই।'

বাবা মাকে সত্যি ভালোবাসতেন। স্ত্রীর অসুস্থতা তাঁকে দুর্বল করে ফেলেছে। মায়ের এ আবদারকে বাবা ফেলতে পারলেন না। কাকাকে পাঠিয়েছিলেন আমার কাছে। আমি আমার কলেজেপড়া ছেলে কৌশিককে নিয়ে দীর্ঘদিন পরে কাউয়ার দ্বীপের সাগরচন্দ্র দত্তের উঠানে হাজির হয়েছিলাম। পাড়ার সব মানুষ সেদিন আমাদের উঠানে জড়ো হয়েছিল। বাবাকে প্রণাম করার পর কৌশিককে দেখিয়ে বলেছিলাম, 'বাবা, এ আপনার নাতি, কৌশিক। আপনার অবহেলিত পুত্রবধূ সুরমার সন্তান।'

বাবা আমার শেষের কথার খোঁচাকে গায়ে মাখলেন না। ঝাপটে ধরলেন কৌশিককে। বুকে এমনভাবে চেপে ধরলেন যেন পারলে কৌশিককে বুকের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলেন। তাকিয়ে দেখলাম—বাবার দু' চোখ বেয়ে জলের ধারা নামছে।

সমবেত মানুষদের মধ্যে আনন্দধ্বনি উঠল। ঘরের ভেতর থেকে মা চিঁ চিঁ করে বলছেন, 'কী হচ্ছে বাইরে ? এত মানুষের আওয়াজ কেন ? কে এল ? প্রফুল্ল এল নাকি ?'

সেদিনই মাকে নিয়ে এসেছিলাম আমার বাড়িতে। বাবা কাতরকণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমি একা এখানে কী করব ? তোমার মাকে কে দেখবে ? আমিও আসি তোমার মায়ের সাথে।' শাশুড়ির সেবা করবার জন্যে যে ওদিকে সুরমা মুখিয়ে আছে, সেটা বাবাকে বলি কী করে! বাবা না গেলেও যে মায়ের বিন্দুমাত্র অযত্ন-অবহেলা হবে না—এ কথা জানালে বাবা যে দমে যাবেন। বাবাও আসুন আমার বাড়িতে এটা আমি মনেপ্রাণে চাইছিলাম।

মায়ের অসুস্থতার কারণে আমার বাড়িতে মহামিলনমেলা বসল। শহুরে ডাক্তারের চিকিৎসায় মা ভালো হয়ে উঠতে লাগল। বাবা-মা-পুত্র-পুত্রবধূ-পৌত্র-পৌত্রী নিয়ে 'প্রচেষ্টা'য় আমার জীবনের আরেকটা অধ্যায় শুরু হলো। সে অধ্যায় শুধু আনন্দের, শুধু সুখের, শুধু উল্লাসের।

BanglaBook.org

এরপর আমার জীবন থেকে অনেকটা বছর ফুরিয়ে গেছে। মা মারা গেছেন, বাবা মারা গেছেন। মেয়ের বিয়ে দিয়েছি কানাডা নিবাসী গৌতমের সঙ্গে, ছেলে বিয়ে করে ঢাকায় চাকরি নিয়েছে। আমি চাকরি শেষ করেছি। সুরমা রিটায়ার করেছে এবং এক ভোররাতে আমার জীবনাকাশ থেকে টুপ করে খসেও পড়েছে সুরমা। আমাকে আগাম কোনো জানান না দিয়ে আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেল সুরমা।

শেষের দিকে আমরা দুটো শয্যায় শুতাম। গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করতাম বলে সুরমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটত। সুরমাই একদিন বলল, 'ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে আমার। আমি কাল থেকে পাশের রুমে শুই, কী বল?'

কাতর চেহারার আমি সম্মতির মাথা নাড়লে পাশে শোওয়া সুরমা আমার খোলা বুকে হাত বুলাতে বুলাতে বলেছিল, 'দরজা তো খোলা থাকবে। জান তো সম্রাট শাহজাহান যমুনার অপর পাড়ে আরেকটা তাজমহলের কাজ শুরু করেছিলেন। কালো রঙ ছিল তার। কালো তাজমহলে তিনি থাকবেন, বর্তমানেরটাতে থাকবেন মমতাজ। যমুনার ওপর থাকবে ব্রিজ। পূর্ণিমাতে পরস্পর যাতায়াত করবেন পরস্পরের তাজমহলে।' তারপর হাসতে হাসতে সুরমা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বলেছিল, 'কখনো তুমি, কখনো আমি যাব আর আসব।' সেরাতে অপার আনন্দে ভেসেছিলাম আমরা।

পরের রাত থেকে আমাদের আলাদা থাকা শুরু হলো। বিরহেও যে প্রেম বাড়ে পরের রাত থেকে আমি অনুধাবন করতে শুরু করেছিলাম।

চলছিল এভাবে জীবন—সোহাগে স্বাচ্ছন্দ্যে। আমাদের বয়স হলে কী হবে আমাদের ভেতরের প্রেমে কিন্তু ছিটেফোঁটাও ভাটা লাগে নি। প্রেম আমাদের টেনে নিয়ে যেত দেহের উপান্তে। আমরা মশগুল হতাম একে অপরকে নিয়ে। বয়স? বার্ধক্য আমাদের জীবনে কখনো প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় নি; বরং বার্ধক্য আমাদের যৌবনকে উস্‌কে দিত। সুরমা মাঝেমধ্যে পেটে চিমটি কেটে সোহাগী কণ্ঠে বলত, 'আসল কাজে বুড়ো হলে না কোনোদিন!'

আমি মুখে কিছু না বলে সুরমাকে বুকের গভীরে টেনে নিতাম। এই সুরমাই এক আজানপড়া ভোরে মারা গেল। টয়লেট করে এসে মৃদু কণ্ঠে আমাকে ডেকেছিল। আমার ঘর থেকে তার কাছে গেলে ও বলেছিল, 'আমার পাশে শোয় তুমি, আমাকে একটু জড়িয়ে ধরো। আমার বুকে একটু হাত রাখো।' বলে চুপ মেরে গিয়েছিল সে।

আমি পাশে শুয়ে সুরমাকে গভীর কামনায় জড়িয়ে ধরেছিলাম। অনেকক্ষণ পর আমি টের পেয়েছিলাম—সুরমার হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে। হয়তো তার বাসনার কথা বলে সে মারা গিয়েছিল অথবা আমার বুকের ওম নিতে নিতে তার প্রাণবায়ু দেহখাঁচা ছেড়েছিল।

BanglaBook.org

সুরমার মৃত্যুর পর সাত বছর কেটে গেছে। এখন আমার সাতষট্টি। বিশাল বাড়িতে থাকি, স্বজনহারা। আপনারা বলবেন—স্ত্রী মারা গেছে তো কী হয়েছে, আপনার কন্যা আছে, পুত্র আছে। আমার কাছে ওরা থেকেও নেই। কখনো কানাডা থেকে, কখনো ঢাকা থেকে ফোন আসে—হাই বাবা, কেমন আছ? নিজের দিকে খেয়াল রাখবে। এইসব কথাবার্তা মেকি। প্রাণ নেই, ভালোবাসা নেই এসব কথায়। ওরা আমার আত্মজ-আত্মজা হলে কী হবে, দূরবর্তী আত্মীয়ের ভালোবাসা দূরস্থানের মতো অস্পষ্ট হয়ে আসে একদিন। আমার ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। যে আমার প্রকৃত আত্মীয় ছিল, সে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। এখন আমি একা, সম্পূর্ণ একা।

সম্পূর্ণ একা বললে ভুল হবে। পদ্মা নামের এক নারী আমার দেখভাল করে এখন। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স তার। বিধবা। মাঝারি ফর্সা। স্বামী ছাড়লে কী হবে যৌবন পদ্মাকে ছেড়ে যায় নি। নিবিষ্ট মনে সে ঘরের কাজগুলো করে যায়, আর নিবিড় চোখে আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকি। আঁচলের ফাঁক দিয়ে কখনো কখনো তার ব্লাউজঢাকা স্তন উঁকি মারে, আমি গোয়ালঘরের সুরমার কাছে ফিরে যাই। সে ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে ফ্লোর মোছে, তার নিতম্ব দোলে এদিক থেকে ওদিকে। আমার লোল জিহ্বা তার নিতম্বের তলায় তলায় ঘোরে।

আমার বিবেক, আমার সমাজ, আমার সংস্কার বলে—কী করছ প্রফুল্ল? তুমি যে অধ্যাপক! এ অঞ্চলের মানুষ যে তোমাকে পরম শ্রদ্ধা করে!

আমি বাসনার গলা চেপে ধরি, খবরদার, আর যদি চোখ দাও পদ্মার দিকে, তাহলে তোমার একদিন কি আমার একদিন।

তারপরও আমার চোখ যায় পদ্মার হাতকাটা ব্লাউজের নিচের অংশে। চেকনাই-কোমরে চোখ আটকে যায় আমার। অজান্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, আহা! কী মনোলোভা!

আমার স্ত্রী সুরমা সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখে কিছু বলে না, শুধু কাতর চোখে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে।

বলি, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো সুরমা, তোমার প্রফুল্ল ঠিক আছে।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি ঠিক থাকতে পারি না। শরীরের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিহরণ জাগে আমার। নির্জনতা শিহরণে প্রাবল্য বাড়ায়। আমি কাজের ছুঁছিলায় রান্নাঘরে যাই, পদ্মার পাশে পাশে ঘুরি।

ঘুরতে ঘুরতে মনে হয় সমাজ অসার, বিবেক অসার। এমনকি সুরমাও অর্থহীন।

সবকিছুকে ছাপিয়ে আমার চোখের সামনে, আমার দেহের সামনে পদ্মাবতীর যৌবনভরা দেহ সারাৎসার হয়ে দেখা দেয়।

BanglaBook.org

রতন

'এই রতনী, কোথায় তুই ?'

'আসি বৌদিমণি। আমি হেঁশেলে। দাদাবাবুর জন্য রুটি বেলছি।' অনুচ্চ কণ্ঠে বলল রতন।

রতনের কথা বৌদিমণি শোবার ঘর থেকে শুনতে পায় নি। তার রাগ হলো।

এবার গলা চড়িয়ে বলল, 'কিরে রতনী, শুনতে পাস নি ? কখন থেকে ডাকতে ডাকতে গলা শুকিয়ে ফেললাম।'

রতন আঁচলে হাত মুছতে মুছতে শোবার ঘরে এল। কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বলল, 'দাদাবাবুর আপিস যাওয়ার সময় হয়েছে। তার জন্যে রুটি বেলছিলাম।'

'রাখ তোর রুটি বেলা। দাদাবাবুর সেবা করতে পারলে শরীরে শান্তির হাওয়া লাগে, তাই না ? সকালে উঠে বিছানা গোছগাছ করিস নি কেন ?' বৌদির উষ্মা বাড়তে থাকে।

'সকালে এসেছিলাম বৌদি। দেখি আপনি তখনো ঘুমাচ্ছেন। ওইদিকে দাদাবাবু আবার চা চাইল। তাই চা বানাতে গেলাম।' রতন করুণ কণ্ঠে বলল।

'ও, এর মধ্যে সেবা একবার হয়ে গেছে তাহলে! চা দিতে গিয়ে লুটোপুটি! মরার ঘুমটা পোড়া চোখে কেন যে এল ভোরসকালে! আমার বিছানা গোছানোর চেয়ে দাদাবাবুর চা বানানো বড় তাহলে তোর কাছে ? দাদাবাবু! চা! ভোরসকালে! আমি ঘুম থেকে উঠার আগে চা পিপাসা! দেখাচ্ছি মজা।' শ্লেষ ঝরে পড়ছে বৌদির গলা থেকে।

রতন নিরুপায়। নির্বাক। মাটির দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তার আর কোনো গত্যন্তর নেই। অধঃবদনে দাঁড়িয়ে থাকল রতন।

এবার ঝাঁঝিয়ে উঠল বৌদিমণি, 'দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? গতরের ভাঁজভুঁজগুলো আঁচল দিয়ে ঢাক। বিছানা গোছা।'

রতনের বয়স কুড়ি-একুশ বছরের মতো। গায়ের রঙ শ্যামলার দিকে। মাথাভর্তি চুল। ছোটবেলা থেকেই তার চুলের বাড়বাড়ন্ত। অযত্নে সে চুল বেঁকেবুঁকে থাকত। পরবর্তীকালে নারকেল তেল আর চিরুনির দু'-চারটা আঁচড় পড়ায় সে চুল বাংলা লাউয়ের ডগার মতন ফনফনিয়ে বেড়েছে। চুলে স্বামী যখন হাত বুলিয়ে বলত, 'রতনরে তোর চুল কী সোন্দর!' তখন রতনের মনে হতো স্বামী বুঝি তার চেয়ে তার চুলকে বেশি ভালোবাসে। জীবনের এত ডামাডোলের মধ্যেও নিজের চুলকে

BanglaBook.org

পারতপক্ষে অবহেলা দেখায় নি রতন। এই যে বৌদিমণির এত অবহেলা আর এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য—এসবের মধ্যেও বিকেলের দিকে সে চুলে একবার চিরুনি বুলায়। এ নিয়ে বৌদির খোঁচাও কম খেতে হয় না। বলে, 'কাজের ঝিয়ের এত বড় খোঁপার দরকার কী ? লম্বা চুলের রাজকুমারী! দেখো না, মাথা ভরে নারকেল তেল দিয়েছে। বলিহারি, এত তেল আসে কোথা থেকে ? মুখেও খাবে, মাথায়ও খাবে।'

রতনের স্পষ্ট মনে আছে—এক সন্ধেয় হিমাংশু কাকা বলল, 'রতনরে, আমি বড় গরিব মানুষ। ঘরে তিন তিনটে ছেলেমেয়ে। তোর কাকি। বুড়ি মা-টাও হাঁটতে পারে না। তুইও এলি। এতগুলো মানুষের হাঁ-করা মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেইরে রতন। কাছের গুলাকে তো আর ফেলে দিতে পারিনে। তুই এক কাজ কর।' বলে হিমাংশু কাকা হুঁকায় টান দিতে থাকে।

রতনের বয়স তখন বারো পার হয় হয়। বাবা মারা গেছে কবে। তার দু' বছর পর ছোট ভাইটাও ডোবার জলে ডুবে মরেছে। মা তাকে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরত। এর ওর কাছে চেয়েচিন্তে দুজনের পেট চলে যেত। মাও একদিন ম্যালেরিয়ায় মরল। চার পাঁচ দিন কালাজ্বরে বেশ কষ্ট পেয়েছিল। তারপর টুপ করে এক রাতে মারা গেল। মা যে মারা গেছে সেরাতে রতন বুঝতে পারে নি। সকালে হিমাংশু কাকারা জড়ো হয়ে যখন বলল, তোর মা মারা গেছেরে রতন। আকুল হয়ে কেঁদেছিল সে-সকালে রতন। পাড়াপড়শিরা রতনের মাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল। সুখলতা কাকি সেদিন আশ্রয় না দিলে কোথায় ভেসে যেত রতন! হিমাংশু কাকাকে উদ্দেশ্য করে সুখলতা কাকি বলেছিল, 'কোথায় যাবে মা-বাপমরা মেয়েটি ? থাক আমাদের সঙ্গে। যা জোটে টেপা, পটল, শৈব্যার সঙ্গে ভাগযোগ করে খাবে।'

সকাল থেকেই হিমাংশু কাকার মনটাও খুব নরম ছিল। ছোট্ট রতনের অসহায় করুণ মুখটি বার বার তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। বউয়ের কথায় সায় দিয়ে বলেছিল, 'ঈশ্বর নাড়ি দিয়েছেন, খাবার বন্ধ করবেন না। থাকুক মেয়েটা আমাদের সঙ্গে।'

সে বছর দুয়েক আগের কথা। এ দু'বছর কষ্টেসৃষ্টে জীবন চলছিল হিমাংশু কাকার। হঠাৎ করে তাকে কাশ ব্যারামে ধরল। দিনমজুর হিমাংশুর আয় কমে গেল। বড় টানাটানি শুরু হলো সংসারে। এই সময় পোস্টমাস্টারের সঙ্গে দেখা, বাজারে। নতুন লোক দেখে সহজাত কৌতূহলে হিমাংশুই এগিয়ে গিয়েছিল ধোপদুরস্ত কাপড়ের পোস্টমাস্টারের দিকে। আলাপ হয়েছিল। নানা কথার ফাঁকে পোস্টমাস্টার বলেছিল ফাইফরমাশ খাটার জন্যে একটা ছোট্ট মেয়ে পেলে বর্তে যায়।

সেই সন্ধেয় রতনের কাছে কথাটি পেড়েছিল হিমাংশু কাকা। রতন কোনো কথা না বলে তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে হিমাংশু কাকা আবার বলেছিল, 'আমাদের

BanglaBook.org

উলাপুর গাঁয়ে একজন পোস্টমাস্টার এসেছে। একা থাকে। নিজ হাতে রেঁধেবেড়ে খায়। হাতের কাজ উজিয়ে-বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে একটা ছোট্ট মেয়ে দরকার। তুই যাবি তাঁর কাছে ? ভালো খাবার পাবি। আদর-যত্ন করবেন।'

রতন সেদিন ডানদিকে আস্তে করে মাথা নামিয়েছিল। বয়স বারো হলে কী হবে, বাস্তব অভিজ্ঞতা তো তার কম হলো না! রোগগ্রস্ত কাকা আর কত দিন খাওয়াবে! দু' বেলায় খাবারে টান পড়ে। কাকাতো ভাইবোনেরা খাবারের জন্যে কান্নাকাটি করে। বুড়ি ঠাকুমা কফের বড় বড় ঢেলা থু থু করে ফেলতে ফেলতে বলে, 'নিজেদের খাবার জোটে না, কোত্থেকে মাগি একটারে নিয়ে এসেছে হিমু। নিজের শোওয়ার জায়গা নেই শংকরারে ডাক।' ওই সময় উঠানের আমগাছের ডালে কাক কা কা করে ওঠে। ঠাকুমা জোরে শ্বাস টেনে বড় একটা কফের ঢেলা উঠানে ছিটিয়ে বলে, 'ঝেঁটা মারি, ঝেঁটা মারি। বিদেয় হ, দূর হ।'

হেঁশেলে কাকিমার সঙ্গে কাজ করতে করতে রতনের কানে কথাগুলো যায়। ছোট হলেও সে বুঝতে পারে, ঠাকুমার এ কথাগুলো তাকে উদ্দেশ করে বলা।

আজকে কাকার প্রস্তাবে তাই রতন না করল না। পরদিন সকালে হিমাংশু কাকা রতনের হাত ধরে পোস্টমাস্টারের কাছে গিয়েছিল। রতন পোস্টমাস্টারের ওখানেই থিতু হলো। কিন্তু সে জানল না—এ শুধু ঘাটবদল। শেওলা যেমন নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে এ-ঘাট থেকে ও-ঘাটে যায়, রতনেরও তাই হয়েছিল—হিমাংশু কাকার সংসার-ঘাট থেকে স্বল্প সময়ের জন্য পোস্টমাস্টারের একাকী জীবনের ঘাটে এসে ভিড়েছিল রতন।

২

বড় ভালোবাসতে শুরু করেছিল দাদাবাবু তাকে। খুব বেশি কাজের চাপ ছিল না। দু'-চারটি থালা গ্লাস ধোয়া, ঘরগুলো ঝাঁট দেওয়া। দাদাবাবুর জামা পেন্টালুন ধুয়ে দেওয়া—এইসব। ও, মাঝেমাঝে সকালে-রাঁধা তরকারি সন্ধেয় গরম করতে হতো তাকে। যে-রাতে দাদাবাবুকে আলস্য জড়িয়ে ধরত, বলত, 'বাসি ব্যঞ্জন আছে ঘরে। খানকয়েক রুটি সেঁকতে পারবি না তুই ?'

রতন হাসিমুখে হেঁশেলের দিকে যেতে চাইলে দাদাবাবু বলত, 'আরে আরে, এখন কোথায় যাস ? বস বস। তোর মা-বাবার কথা বল, শুনি। বল দিখিনি কে কে ছিল তোর ?'

সে সন্ধেয় গাঁয়ের গোয়ালঘর থেকে কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া উঠত, ঝোপে ঝোপে ঝিঁঝিঁপোকা ডাকত। অনতিদূরের জঙ্গলে শেয়াল হেঁকে যেত—হুক্কাহুয়া। আরও দূরের বাউল-আস্তানা থেকে অস্পষ্ট কিন্তু মধুময় গানের সুর ভেসে আসত।

দাদাবাবু বলত, 'একা একা বড় খারাপ লাগেরে রতন। কলকাতার ছেলে আমি। চারদিকে কত মস্ত মস্ত ঘরবাড়ি। সাপের মতো এঁকেবেঁকে বিশাল বিশাল রাস্তা এদিক

BanglaBook.org

থেকে ওদিকে চলে গেছে। আর এখানে দেখ—সন্ধে হলে ঘন অন্ধকার। চারদিকে ঝোপঝাড়। মাঝে মাঝে দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ। পানাপুকুর। ঘনঘোর বৃষ্টি। মস্ত মস্ত দাড়াওয়ালা মশা। এই আটচালার আঁধার ঘরে আমার দম বন্ধ হয়ে আসেরে রতন।'

রতন দাদাবাবুর এসব কথার মানে ভালো করে বুঝতে পারে না। মনের চোখকে সে কলকাতা পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়। কলকাতাকে সে তো কখনো দেখে নি। কিন্তু কল্পনায় রতন সেই মস্ত বিশাল রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকে, মাঝে মাঝে ফিরে দেখে দাদাবাবু তার পেছনে আছে কি না।

দাদাবাবু তাকে বর্ণ শেখাল। যুক্তবর্ণ ভেঙে ভেঙে পড়তে শেখাল। যখন তার মন ভালো থাকত, তখন ছাত্রীটিকে পড়াত, শেখাত। রতন খেয়াল করেছে—এসবের মধ্যেও মাঝেমধ্যে দাদাবাবুর মন খুব খারাপ হয়ে যেত।

তখন দাদাবাবু কথা বলত না। জানালার ফাঁক দিয়ে চুপচাপ আকাশের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকত। চোখে পলক পড়ত না। দাদাবাবু বৃষ্টিকে বড় অপছন্দ করত। কিন্তু যেদিন মেঘ কেটে ঝলমলে রোদ উঠত, সেই রোদের দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকত দাদাবাবু। কোনো কথাই বলত না সেসময়। ঘরের টুকটাক কাজ করবার সময় রতন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত—দাদাবাবুর চোখ জানালার ফাঁক দিয়ে বিশাল আকাশে হারিয়ে যাওয়া কী একটা মহামূল্যবান বস্তু যেন খুঁজে ফিরছে। সেসময় দাদাবাবুর মুখের রঙ পাল্টে যেত। গভীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নটি দাদাবাবু কোনো কথা না বলেই কাটিয়ে দিত।

যেদিন দাদাবাবুর জ্বর হলো, প্রথমে বুঝতে পারে নি রতন। দাদাবাবু যখন বলল, 'দেখ তো রতন, জ্বর হলো বুঝি আমার। চোখ আঁধার আঁধার লাগছে।'

সেরাতে জননীর মতো সেবা করেছিল রতন দাদাবাবুকে। জলপট্টি দেওয়া, পথ্য খাওয়ানো। সারা রাত জেগে শিয়রে বসে বারবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'একটু ভালো লাগছে দাদাবাবু?'

ভালোই চলছিল রতনের জীবন। সে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বারবার ঈশ্বরকে বলত, ঠাকুর, এভাবে যেন আমার জীবনটা কেটে যায়।

৩

কিন্তু জীবন সেভাবে কাটল না। দাদাবাবু চাকরি ছেড়ে দিয়ে, উলাপুরের মায়া কাটিয়ে, রতনের কথা ভুলে নৌকায় উঠল। 'রতনের কথা ভুলে' বললে ভুল হবে। যাওয়ার সময় দাদাবাবু রতনকে নতুন পোস্টমাস্টারের হাতে গছিয়ে দিতে চেয়েছিল। যেন পুরনো তক্তপোশ। যত দিন প্রয়োজন একজন ব্যবহার করল, যাওয়ার সময় নিয়ে যেতে পারবে না বলে আরেকজনকে দিয়ে দিল। রতনকেও দাদাবাবু তক্তপোশ ভেবেছিল।

BanglaBook.org

রতন অন্যজনের হতে চায় নি। দাদাবাবুকেই পছন্দ তার। তার সঙ্গেই যেতে চেয়েছিল। বলেছিল, 'দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?'

আকাশ থেকে পড়েছিল দাদাবাবু। 'সে-কী রে' বলে চুপ মেরে গিয়েছিল। কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেয় নি দাদাবাবু। দিলে কিছুটা হলেও রতনের মনের বেদনা কমত। তারপর তো দাদাবাবু তাকে টাকা গছাতে চেয়েছিল। একদৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে না গেলে শেষ পর্যন্ত কী কাণ্ডটাই না ঘটত কে জানে!

পালে জোর বাতাস লাগলে নৌকা তরতর করে এগিয়ে গিয়েছিল। দাদাবাবুর মন বিষণ্ণতায় ভরে উঠেছিল সেসময়। ফিরে যেতে ইচ্ছে করেছিল একবার। যখন কোনো কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়, তখন সে-কাজ করার জন্যে মানুষের মন উদ্‌গ্রীব হয়। তারপর বাস্তবতার দোহাই দিয়ে সে ওই কাজ করা থেকে বিরত হয়। এবং অচিরেই পেছনের সবকিছু ভুলে যায়। পোস্টমাস্টারেরও হয়েছিল তা-ই।

পোস্টমাস্টার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে চাকরি ছাড়ার আবেদনপত্র পাঠিয়ে উলাপুর থেকে কলকাতায় রওনা দিয়েছিল।

কলকাতায় ফিরে চাকরি ছাড়ার কথা বলায় মা আমূল ভেঙে পড়েছিল। 'কী বলিস খোকা! চাকরি ছেড়ে দিয়েছিস! খাব কী? তোর ভাইয়ের পড়াশোনা, বিধবা দিদির ভরণপোষণ চলবে কী করে রে বাবা! তোর দিকেই তো আমরা তাকিয়ে ছিলাম। বাবা নাই তোর। তুই-ই তো আমাদের শেষ আশ্রয়।'

দিশেহারা হয়ে পড়েছিল পোস্টমাস্টার। আবেগ ভালো জিনিস। আবেগের জন্য আশা-ভরসা, মানুষের বেঁচে থাকা। আবেগের সঙ্গে বাস্তবজ্ঞান মিশালে মানুষের জীবন সুস্থির হয়। পোস্টমাস্টারের আবেগ বেশি। বাস্তবজ্ঞান কম। আবেগতাড়িত হয়ে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে কলকাতায় ফেরত এসে পোস্টমাস্টার বুঝতে পারল কত বড় ভুল করেছে সে। ইস্তফাপত্র লেখার সময় ভাইবোন আর মায়ের ভবিষ্যতের কথা ভাবে নি, ভাবে নি গোটা পরিবার তার দিকেই তাকিয়ে আছে। মায়ের কথা, ভাইয়ের অসহায় মুখ, বোনের বিষণ্ন নীরবতায় পোস্টমাস্টারের বাস্তববুদ্ধি জন্মাল। ছুটে গেল সে পূর্ণচন্দ্রের কাছে। পূর্ণচন্দ্র তার সহপাঠী। পূর্ণচন্দ্র পোস্টমাস্টারের সঙ্গেই চাকরিতে ঢুকেছে। মামার জোর থাকায় কলকাতাতেই তার পোস্টিং হয়েছে। মামা হেমাঙ্গবাবু ব্রিটিশ সরকারের গোমস্তা। পূর্ণচন্দ্রের সামনে প্রায় আছড়ে পড়ল পোস্টমাস্টার, 'ভাই, ভুল করে ফেলেছি মস্তবড়। চাকরিতে ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছি। তুমি বাঁচাও আমাকে।'

পূর্ণচন্দ্র বলল, 'কী হয়েছে বলবে তো!' পূর্ণচন্দ্র মামার পরিচয়ে আর নিজের কর্মদক্ষতায় কলকাতার প্রধান পোস্টাপিসের বড়কর্তা হোয়াইটহেডের নজরে পড়েছে। তাই তার কথায় আস্থার সুর। 'কী হয়েছে বলবে তো'—পূর্ণচন্দ্রের এই কথার মধ্যে ভরসার ইঙ্গিত।

পোস্টমাস্টার আদ্যপ্রান্ত সব খুলে বলল পূর্ণচন্দ্রকে। উলাপুর গাঁ, একাকিত্ব, জঙ্গলভরা সাপ-শেয়াল, ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাং, কর্দমাক্ত মেটে পথ। এসবের ভয়

Banglabook.org

জাগানিয়া বর্ণনা দিল পূর্ণচন্দ্রকে। একটু মিথ্যে মিশিয়ে বারবার করে ভয়ংকর জ্বরে পড়ার কথা বলল। শুধু চেপে গেল রতনের কথা। সবকিছু শুনে পূর্ণচন্দ্র বলল, 'ঠিক আছে। কাল তো রোববার। বন্ধের দিন। সোমবার এসো। দেখি, বড়সাহেবকে বলে কিছু করা যায় কি না।'

পূর্ণচন্দ্র হোয়াইটহেডকে অনুনয়-বিনয় করে শুধু পোস্টমাস্টারের চাকরিই রক্ষা করল না, দক্ষিণ কলকাতার ছোট একটা পোস্টাপিসে পোস্টিংও পাইয়ে দিল।

৪

এরপর এক একটা বছর গত হয়েছে। আর এ-পোস্টাপিস থেকে ও-পোস্টাপিস করে করে খোদ কলকাতার প্রধান অফিসে পোস্টিং পেয়েছে পোস্টমাস্টার। এক দুই তিন করে করে পদোন্নতিও হয়েছে তার। এখন সে প্রধান পোস্টাপিসের হোমরাচোমরা কর্মকর্তাদের একজন।

এর মধ্যে অবশ্য পোস্টমাস্টারের ভাইটি পড়াশোনা শেষ করে রেলে চাকরি নিয়েছে। বিধবা বোনটিও মারা গেছে। মা মারা যাওয়ার আগে বিধুমুখীর সঙ্গে তার বিয়েটা সম্পন্ন করে গেছে। বিয়ের পর পরই পোস্টমাস্টার বুঝতে পেরেছে—বিধুমুখী মুখরা, মর্মভেদী কথায় তার তুলনা নেই। শাশুড়ির মৃত্যুর পর বিধুমুখী মারমুখী হয়ে গেল। পোস্টমাস্টার এই মারমুখীর কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্য কোনো উপায় দেখল না। ঘরের সকল কর্তৃত্ব বিধুমুখীর হাতে চলে গেল।

বিধুমুখী বাঁজা। বাঁজা নারীরা হয় চুপসে যায়, নয় মারমুখী হয়ে ওঠে। বিধুমুখীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টা হয়েছে। প্রথম প্রথম বন্ধ্যাত্বের কারণে নিজেকে খুব অসহায় বোধ করলেও অল্প সময়ের মধ্যে ওই অবস্থা থেকে সে নিজেকে মুক্ত করে ফেলল। তার ভেতরের জ্বালা মুখ দিয়ে অনল হয়ে বের হতে লাগল। স্ত্রীর কারণে পোস্টমাস্টারকে আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করতে হলো। একমাত্র ভাই, সেও দাদার বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিল। ঝিরা বেশিদিন চাকরি করতে পারে না পোস্টমাস্টারের বাড়িতে। বড়জোর দশ-বারো দিন। বেতন চাইতেও সাহস করে না। বিধুমুখীর দাপটে আর কলজেয় টানমারা কথায় ঝিরা পালিয়ে বাঁচে। গজরাতে গজরাতে বিধুমুখী ঘরকন্নার কাজ নিজ হাতে করে। বিধুমুখীকে বেশিদিন গজরাতে হলো না। রতন এসে উপস্থিত হলো।

৫

দাদাবাবু রতনকে ত্যাগ করে আসার পর দীর্ঘক্ষণ ধরে উলাপুরের সেই আটচালা পোস্টাপিসের চারদিকে অশ্রুসজল চোখে রতন ঘুর ঘুর করল। মনে আশা—দাদাবাবু ফিরে আসবে। তার সঙ্গে এত বড় বেদরদি কাজ দাদাবাবু নিশ্চয় করবে না। তার মধ্যে একসময় না একসময় অনুশোচনা জাগবে। বুদ্ধিহীন রতন বুঝল না—বাস্তবতা

কত কঠিন, সত্য কত রূঢ়। বুঝল তখন, যখন পথ চেয়ে চেয়ে তার অশ্রুসজল চোখ ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ল, হৃদয়ের রক্ত যখন একেবারে ফুরিয়ে গেল, ক্ষুধায় সমস্ত শরীর যখন অবশ হয়ে এল।

শেষ পর্যন্ত নিজের শরীরটাকে টানতে টানতে রতন হিমাংশু কাকার বাড়িতে উপস্থিত হলো।

হিমাংশু কাকা রতনকে দূর-ছেই করল না। সব শুনে শুধু অসহায় মুখে বলল, 'আমি তোকে কী করে খাওয়াব রে মা! আমার সংসার তো একেবারে অচল হয়ে গেছে!'

কাকিমা হেঁশেল থেকে বের হয়ে বলল, 'আসতে না-আসতেই অভাবের কথা বলে মেয়েটার দুঃখটা আর বাড়িয়ো না। ঈশ্বর আছেন। মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? দাওয়ায় বসতে দাও।'

রতন হিমাংশুর ঘরে দ্বিতীয়বারের মতো আশ্রয় পেল।

কিন্তু হিমাংশুর ঘরে রতনকে খুব বেশিদিন থাকতে হলো না। অল্পসময়ের মধ্যে দোজবর খগেনবাবুর সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল।

খগেনবাবুর বাড়ি উলাপুর গাঁয়ের ঠিক পাশের গাঁ কালীকৃষ্ণপুরে। নীলকুঠির সাহেবদের সঙ্গে খগেনবাবুর খুব ঘনিষ্ঠতা। গরিব চাষিদের বাছা বাছা জমিতে নীলচাষ করার জোরজবরদস্তিতে ইংরেজদের ডানহাত হিসেবে কাজ করেছেন খগেনবাবু। এজন্যে নানা সময়ে পুরস্কারও মিলেছে কুঠিয়ালদের কাছ থেকে। ইংরেজ প্রভুদের কৃপায় খগেনবাবুর জমিজমা আর টাকাকড়ির অভাব নেই। তাঁর ঘরে সন্তানের অভাবও রাখেন নি ঈশ্বর। চার চারটা ছেলে তাঁর ঘরে। মেয়েটাকে কলকাতার এক বনেদি পরিবারে বিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ঈশ্বর হঠাৎ করে ষাট ছুঁই ছুঁই খগেনবাবুকে একটা জিনিসের অভাবে ফেললেন। সে বউ। এই বয়সেই তার স্ত্রী মারা গেল। কিন্তু ওই যে, যে বাঘ একবার মানুষের রক্তের সন্ধান পেয়েছে, সে সর্বদা মানুষই খুঁজে বেড়ায়। পুরুষের কাছেও নারীদেহ সেরূপ। বয়স যা-ই হোক, রাতে পুরুষমানুষের পাশে নারী না থাকলে চলে না। খগেনবাবুর অবস্থাও সেরকম হলো। ফলে নারী খোঁজা শুরু হলো। ছেলেরা জানতে পেরে বেজায় অখুশি হলো। কিন্তু খগেনবাবু বলে কথা। ছেলেদের শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, 'আমার ইচ্ছের বিরোধিতা করলে পথের ফকির হতে হবে।'

ভবিষ্যতের লোভে ছেলেরা চুপ মেরে গেল। শেষ পর্যন্ত ঘটক হিমাংশুর বাড়িতে উপস্থিত হলো। কোনো এক শুভক্ষণে দাদুর বয়সী খগেনবাবুর সঙ্গে রতনের বিয়ে হয়ে গেল।

BanglaBook.org

বিয়ের পর অনেকটা বছর কেটে গেল। সেবা দিয়ে খগেনবাবুর দেহ ও মন ভরিয়ে তুলল রতন।

বিয়ের আট বছরের মাথায় খগেনবাবু মারা গেলেন।

নীলকুঠিতে কী সব ছাইপাঁশ গিলে এসে এক বিকেলে ভেদবমি শুরু হলো খগেনবাবুর। পরদিন আলো ফুটবার আগেই খগেনবাবুর জীবন-আলো ফুরিয়ে গেল।

মাসখানেক পরেই পথে নামতে হলো রতনকে। বাপের ভয়ে ছেলেরা এত দিন বাড়িতে রতনকে মেনে নিয়েছিল। শ্রাদ্ধ সাঙ্গ হওয়ার পর পরই কিছু টাকাকড়ি রতনের আঁচলে বেঁধে দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিল তারা।

৬

রতনের যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। হিমাংশু কাকা বছরচারেক আগে মারা গেছে। তার মা-ও গত হয়েছে অনেক আগে। নাবালক সন্তানদের নিয়ে কাকিমা কোথায় যে চলে গেছে গ্রামবাসীরা বলতে পারল না। সে ঠিক করল, কলকাতায় যাবে। যদি দাদাবাবুর দেখা মিলে! অন্তত আশ্রয়টা তো দাদাবাবু তাকে দেবে! অনেক ঘাটে ধাক্কা খেতে খেতে একদিন সে কলকাতায় এসে পৌঁছাল। রতনের মনে আছে তার দাদাবাবু পোস্টাপিসে চাকরি করত। এখন চাকরি করে কি না বা দাদাবাবু তো পোস্টাপিসের চাকরিতে ইস্তফা দিয়েই উলাপুর ছেড়েছিল—এসব কথা রতনের মাথায় এল না। শুধু বিশ্বাস করল—কোনো পোস্টাপিসে গেলে দাদাবাবুর দেখা মিলবে। একজন সহৃদয় ব্যক্তি তাকে কলকাতার প্রধান পোস্টাপিসে পৌঁছে দিল। লোকটি ভেবেছে—পোস্টাপিসের চাকরি যখন, প্রধান পোস্টাপিসে হদিস থাকবে।

সেখানেই দাদাবাবুর সঙ্গে রতনের দেখা মিলল।

দাদাবাবুর পায়ের কাছে বসে রতন গতজীবনের সব কথা খুলে বলল। বিবেক দাদাবাবুর গলা চেপে ধরল। একবার ভুল করেছে, আর না। রতনকে আশ্রয় দিতেই হবে এবার। বুকে অসীম সাহস সঞ্চয় করে রতনকে বাড়িতে নিয়ে চলল দাদাবাবু। যেতে যেতে রতনকে বলল, 'রতন, তোর সঙ্গে যে আমার আগে পরিচয় হয়েছিল, তুই যে উলাপুরের সেই রতন, এটা কোনোদিন খাণ্ডারনির কাছে স্বীকার করিস না।'

বোকা বোকা চাহনি নিয়ে রতন জিজ্ঞেস করল, 'খাণ্ডারনি কে দাদাবাবু?'

'খাণ্ডারনি—!' বলে দীর্ঘ একটা শ্বাস টানল দাদাবাবু। ভয়ে বুকের সব বাতাস বেরিয়ে গেছে, সাহস সঞ্চয়ের জন্যে বায়ুহীন সে বুকে যেন বায়ু ভরে নিল দাদাবাবু। একটু থেমে আবার বলল, 'ও কিছু না। শুধু তুই আমার এই অনুরোধটুকু রাখিস। নিজের পূর্বপরিচয় দিস না।' তারপর স্বগত কণ্ঠে বলল, 'কেন যে মায়ের প্ররোচনায় বিধুমুখীকে ঘরে তুলেছিলাম! ও ঘরে আসার পর থেকে ঘোর অমাবস্যা শুরু হয়েছে আমার জীবনে।'

রতনকে দেখে ঝংকার দিয়ে উঠেছিল বিধুমুখী, 'এ কাকে নিয়ে এসেছ আমার ঘরে? কে এ?'

BanglaBook.org

পোস্টমাস্টার কাঁচুমাচু মুখে নরম সুরে বলেছিল, 'দেখো বিধু, অনেক দিন ধরে বহু কষ্ট করে তুমি ঘরকন্না সামলাচ্ছ। তোমার কষ্ট দেখে আমার বুক ফেটে যায়। কিন্তু কিছুই করতে পারি না আমি। আজ একে পেলাম, নিয়ে এলাম। আজ থেকে সকল কাজ রতন করবে। তুমি শুধু হাত ধুয়ে পাতে বসবে।'

আগের ঝিটা চলে গেছে অনেক দিন। ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম করতে করতে বিধুমুখীর হাড়মাস জর জর। রতনকে পেয়ে বিধুমুখী যেন স্বর্গ পেল। কিন্তু খুশি হওয়ার ব্যাপারটি স্বামীকে বুঝতে দেওয়া যাবে না।

মুখ কঠিন করে বলল, 'কী জানি বাপু, রাস্তা থেকে কাকে ধরে এনেছ। গা-গতর থেকে তো চেকনাই ঝরে পড়ছে।'

'তাহলে ফেরত পাঠিয়ে দিই। পূর্ণচন্দ্র বলছিল—তুমি না রাখলে ও নিয়ে যাবে রতনকে।' বলল পোস্টমাস্টার।

এবার টনক নড়ল বিধুমুখীর। কণ্ঠ একটু নরম করে বলল, 'এনেছ যখন রেখে দাও। তবে বাপু আমার এক কথা, কোনো গন্ডগোল পাকালে ঘাড় ধরে কিন্তু রাস্তায় নামাব আমি।'

করুণ চোখে রতনের দিকে তাকিয়ে দাদাবাবু বলল, 'তাহলে রতন, তুমি থাকার একটা আশ্রয় পেলে। বৌদির মন জুগিয়ে চলবে।'

সেই থেকে রতন আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে বৌদিমণির মন জুগিয়ে চলতে। কিন্তু কিছুতেই বৌদির মনকে বাগে আনতে পারে না রতন। কাজে ত্রুটি হলে শুধু বকাঝকা করত বৌদিমণি। ইদানীং সন্দেহ করা শুরু করেছে রতনকে। আকারে ইঙ্গিতে এটাই বোঝাতে চায় বৌদি—রতন অধিক মাত্রায় দাদাবাবুর সঙ্গে ঢলাঢলি করছে। আজকে চা বানিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি ওই সন্দেহরই ফল।

আরেক দিনের কথা। সেদিন রোববার, সাপ্তাহিক ছুটির দিন। সকালে দাঁত মাজতে মাজতে পোস্টমাস্টার বলল, 'কোথায় তুমি ?'

ঝাঁঝালো সুরে ভেতরঘর থেকে উত্তর এল, 'কী হয়েছে ? এত চেঁচাচ্ছ কেন ?'

বিধুমুখীর তিক্ত কণ্ঠকে আমল না দিয়ে নরম সুরে পোস্টমাস্টার বলল, 'আজ রোববার, ছুটির দিন। ঘরে আছি। পাঁঠার মাংস খেতে ইচ্ছে করছে বড়। তুমি তো ভালোই মাংস রাঁধতে পার।'

শেষের কথায় বিধুমুখীর মনটা একটু নরম হলো। বলল, 'পাঁঠার মাংস কোথায় পাব যে রাঁধব।'

উৎসাহী গলায় পোস্টমাস্টার বলল, 'আমি বাজারে যাচ্ছি। তুমি মাংস রান্নার আয়োজন করো।'

BanglaBook.org

বাজার থেকে ফিরে পোস্টমাস্টার দেখে—ঘরে তুলকালাম কাণ্ড। আলু কুটতে গিয়ে রতন ডানহাতের বুড়ো আঙুল কেটে ফেলেছে। ত্যানা চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। জড়সড় রতন হেঁশেলের এককোনায় দাঁড়িয়ে আছে। বিধুমুখীর মুখে খই ফুটছে, 'বুড়া বয়সে দামড়া হতে চায়। পাঁঠার মাংস খাবে! শরীর তাগড়া করবে! সকালে উঠেই আবদার—ওগো, পাঁঠার মাংস খেতে বড় সাধ জেগেছে। বাজারে যাচ্ছি। এদিকে আমার হয়েছে কাল। মুখপুড়ি একজনকে ঘরে এনে তুলেছে। এত বড় ধুমসি, আলুটা পর্যন্ত কুটতে পারে না। আঙুল কেটে ফেলল। হায় হায়! এখন আমি কী করি! আমি কী করে এতগুলো কাজের সামাল দিই!'

রতন নিচু স্বরে বলল, 'বৌদি, তুমি আমার মাথায় ঠেলা না মারলে আঙুল কাটত না। তোমার ঠেলায় আলু ফসকে গিয়ে আঙুলটা বঁটির ওপর পড়ল।'

'চুপ। একেবারে চুপ। মুখের ওপর কথা! তিনটে আলু কুটতে ছাব্বিশ ঘণ্টা লাগে? তাড়াতাড়ি করবার জন্যে মাথায় হাতটা ছুঁইয়েছি মাত্র। তাতেই ননীর পুতুল গলে গেল! সোনার আঙুল ফালাফালা! বদমাশের ধাড়ি কোথাকার!'

পোস্টমাস্টার মিনমিনে গলায় বলল, 'এই সাতসকালে এত চোটপাট কেন? কী হয়েছে খুলে বলো। এত গালিগালাজ করছ কেন রতনকে?'

'কী, আমার মুখের ওপর কথা! তলে তলে এত পিরিত!'

এবার পোস্টমাস্টার গলা উঁচু করে বলল, 'মুখ সামনে কথা বল বিধুমুখী।'

'খবরদার। আর একটি কথা রতনের পক্ষ নিয়ে বলেছ তো লঙ্কাকাণ্ড হয়ে যাবে এ ঘরে, বলে দিলাম। ও এ বাড়ির ঝি। ওকে বকব, কাটব—সে আমার ব্যাপার। তুমি নাক গলাতে আসছ কেন?'

'তাই বলে বদমাশ, ধাড়ি, ধুমসি—এসব?' পোস্টমাস্টার বলল।

'হ্যাঁ, আমার যা ইচ্ছে, তাই আমি বলব। এই ধুমসি, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা, ঘর মোছা শুরু কর।'

এবার পোস্টমাস্টার সরোষে বলল, 'না, ও ঘর মুছবে না। একটা মেয়ের আঙুল কেটে চৌচির। রক্ত ঝরছে এখনো। ময়লা পানি লাগলে পচন ধরবে।'

বিধুমুখী শ্লেষভরা কণ্ঠে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'ও আবার মেয়ে হলো কখন? শরীরের টইটম্বুর অবস্থা দেখেও তোমার মনে হচ্ছে ও মেয়ে! ও যদি মেয়ে হয়, তাহলে টসটসে যৌবনের নারী কোন জন? আর পচনের কথা বলছ? সে এই ঘরের বাঁদি। বাঁদির হাত পচলেও কী, পাছা পচলেও কী?'

পোস্টমাস্টারের ভেতরটা রাগে ক্ষোভে জ্বলে উঠল। তীব্র গলায় বলল, 'আঙুল ভালো না হওয়া পর্যন্ত রতন এ ঘরের একটি কাজও করবে না। এই আমার শেষ কথা।'

BanglaBook.org

'তাহলে তুমিও আমার শেষ কথা শোনো—এই রতনী, হাড়বজ্জাতটি আমার ঘর ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমি জল পর্যন্ত স্পর্শ করব না।' বলে হাতের পাতিল মেঝেতে আছড়ে ফেলল বিধুমুখী। ঝন ঝন আওয়াজ ঘরের ভেতরের বাতাসে প্রবল আলোড়ন তুলল। সেই আওয়াজ দরজা জানালা ভেদ করে কলকাতার বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল।

হঠাৎ করে পোস্টমাস্টার নির্বাক হয়ে গেল। বিধুমুখীর আজকের রূপ দেখে সে স্তম্ভিত, বিমূঢ়। বৈঠকঘরে গিয়ে চোখ বন্ধ করে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল পোস্টমাস্টার।

তারপর রতন চোখে জল ঝরাতে ঝরাতে ঘর মুছল, সকালের বাসি কাপড়চোপড় ধুল। কিন্তু বিধুমুখীর এক কথা—রতনকে এ বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে। শোওয়ার ঘরে ঢুকে সে দরজায় খিল দিল।

পাঁঠার মাংস পড়ে রইল হেঁশেলের এক কোনায়। আলু, পটল, কাঁকরোল এধারে ওধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকল। গোটা দুপুর চুলায় আগুন জ্বলল না।

বিকেলের আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে। বৃষ্টি পড় পড়। রতন দাদাবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল। হাতে কাপড়ের একটা পোঁটলা। 'দাদাবাবু, আমি যাচ্ছি'—শুনে গদিতে হেলান দেওয়া পোস্টমাস্টার চোখ খুলল। দেখল—তার সামনে রতন দাঁড়িয়ে। মেঝের দিকে চোখ তার। কিছু না বলে রতনের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকল পোস্টমাস্টার।

'যাই দাদাবাবু।' বলে উপুর হয়ে প্রণাম করল রতন।

তারপর বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে গলা উঁচিয়ে রতন বলল, 'বৌদিমণি, দরজা খোলেন। আমি যাচ্ছি। আপনি জল স্পর্শ করেন।'

মূল দরজা খুলে রাস্তায় নামল রতন। রতনের পেছনে তিক্ত অতীত আর সামনে অজানা ভবিষ্যৎ।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

থুতু

'যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই,
করতে হবে।
রাজাকারের বিচার চাই,
করতে হবে।'

চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে সারিবদ্ধ মানুষ দাঁড়িয়ে। তাদের প্রত্যেকের হাতে প্লেকার্ড। প্লেকার্ডে নানা কথা লেখা—

'একাত্তরের রাজাকার
এখন যে দেশদরদী,
ওদের হাতে মরেছিলো
বাবা এবং বড়দি।'

'আর কিছু নয় চাইছি বিচার
দেশজনতা বাদী
ফাঁসির মঞ্চে ঝুলে থাকুক
যুদ্ধাপরাধী।'

মাথার ওপর ভাদ্রের কড়া রোদ। দর দর করে ঘামছে মানুষগুলো। বয়সীরা পকেট থেকে রুমাল বের করে মাঝে মাঝে কপালের ঘাম মুছে নিচ্ছে। নবীনরা রোদ, ঘাম—এসবকে উপেক্ষা করে মুষ্ঠিবদ্ধ হাত তালে তালে ওপরে উঠিয়ে আওয়াজ তুলছে, 'রাজাকারের বিচার চাই, যুদ্ধাপরাধীর বিচার চাই।'

একটু দূরে আইল্যান্ডের ওপর দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ। নির্বিকার। এরকম হাজার স্লোগান তাদের শোনা। কত জঙ্গি মিছিলকে তাদের ধাওয়া দিতে হয়! সেই মিছিলে কত কিসিমের মানুষ! লুঙ্গিপরা থেকে জিনসের প্যান্টপরা, রিকশাওয়ালা-ঠেলাওয়ালা থেকে রিটায়ার্ড সরকারি কর্মকর্তা, টোকাই থেকে ভবঘুরে ভিক্ষুক। মুখে সবার দাবি এক হলেও কারও কারও উদ্দেশ্য ভিন্ন। ধান্ধাবাজরা মিছিলে ঢুকে পড়ে। কেউ পকেট মারে, কেউ তক্কে তক্কে থাকে কখন লুটপাট শুরু করা যায়। শান্তিপূর্ণ মিছিলের নির্দেশ থাকলেও মিছিলের ভেতর থেকে হঠাৎ করে এসব উদ্দেশ্যবাদীরা জঙ্গি হয়ে ওঠে। মিছিলের মধ্য থেকে একজন কড়াহাতে পুলিশের মাথা লক্ষ্য করে ঢিল ছোড়ে। রণং দেহি বলে পুলিশরা এগিয়ে যায় মিছিলের দিকে। লাঠিপেটা, পাথর ছোড়া, ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া, জলকামান। সবশেষে রক্তারক্তি।

BanglaBook.org

সে তুলনায় আজকের মানুষগুলো নিরীহ। কেমন জানি ম্যাড়ম্যাড়ে ওদের গলার আওয়াজ। অনেকে আবার দাবি ছেড়ে কথায় মশগুল। তাই পুলিশরা নির্বিকার। বটগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে কেউ কেউ চোখ বুজে আছে, শীতসকালে মাছধরার জন্যে হাঁটুপানিতে একপা তুলে যেমন করে বকরা ঝিম মেরে থাকে।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ তীব্র একটা আওয়াজে পুলিশদের ঘুমে চটকা লাগল। হেলান ছেড়ে ধড়ফড়িয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল তন্দ্রামগ্নরা। দেখল—চব্বিশ পঁচিশ বছরের একজন তরুণী লাগামছাড়া কণ্ঠে বলছে, 'মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা চাই, দিতে হবে।'

শুধু পুলিশরা নয়, সারিবদ্ধ মানুষেরাও তার দিকে তাকাল, পাশের জনেরা ঘাড় ফিরিয়ে আর দূরের মানুষেরা শরীর বেঁকিয়ে।

আজকের মানববন্ধনের উদ্দেশ্য ছিল—যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি। রাজাকাররাও যুদ্ধাপরাধী। তাই বড় বড় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবির সঙ্গে রাজাকারদের বিচারও চাওয়া হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধার কথা এখানে আসার কথা নয়। কিন্তু হঠাৎ করে ফারহানা আওয়াজ দিল—মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা চাই। সবাই হকচকিয়ে গেল। স্লোগান ভুলে প্রশ্নবোধক চোখে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। একটুক্ষণ পরে ফারহানাও বুঝতে পারল নিজের অসংলগ্নতার ব্যাপারটি। ওইসময় পাশে দাঁড়ানো সৈকত জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার ফারহানা, হঠাৎ করে সিরিয়াস গলায় এরকম স্লোগান দিলি যে!'

ফারহানা কিছু বলল না। অসহায় ভঙ্গিতে সৈকতের দিকে তাকিয়ে থাকল। এইসময় সারি থেকে রাশেদ চিৎকার করে উঠল, যুদ্ধাপরাধীর বিচার চাই। সমস্বরে সবাই বলল, করতে হবে।

মানববন্ধন শেষ হয়েছে। প্রেসক্লাবের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রাশেদ বক্তৃতা দিচ্ছে। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে অন্যরা। রাশেদ বলছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে কবে। এখনো ইউরোপ-আমেরিকায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হচ্ছে। অপরাধীদের বয়স যতই হোক, বিচারের হাত থেকে কেউ রেহাই পাচ্ছে না। আর আমাদের দেশে যুদ্ধাপরাধীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে; এমনকি মন্ত্রী-উপমন্ত্রী হয়ে গাড়িতে স্বাধীনদেশের পতাকা লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা কি মানুষ ? যদি মানুষ হই, তাহলে এই অরাজকতা, দেশের এত বড় অপমান সহ্য করছি কী করে ?

রাশেদের বক্তৃতা চলতে থাকে। একসময় ফারহানা জটলা থেকে বেরিয়ে আসে। কী যেন ভাবছে সে, গভীরভাবেই ভাবছে। মাথা নিচু করে চেরাগি পাহাড়ের দিকে হাঁটতে থাকে ফারহানা।

'কোথায় যাবি এখন ?' একটু পেছন থেকে সৈকত জিজ্ঞেস করে। সৈকত যে তার পেছন পেছন আসছে টের পায় নি ফারহানা।

সৈকতের প্রশ্ন শুনে চমকে ফিরে তাকায় ফারহানা। একটুক্ষণ দাঁড়ায়। সৈকত এগিয়ে এলে দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে।

BanglaBook.org

'বললি না তো কোথায় যাবি ?' সৈকত আবার জানতে চায়।

'এই যাচ্ছি—।' ফারহানা দায়সারা উত্তর দেয়।

'এই যাচ্ছি বলে আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছিস ?'

'না। এড়াতে চাইছি না। আসলে কোথায় যাব তেমন করে ঠিক করি নি। তবে—।' ফারহানা নরম সুরে বলে।

'তবে—?' বলে সৈকত ফারহানার মুখের দিকে তাকায়।

'বাতিঘরে যেতে পারি। সেখানে একটা বই এসেছে, মুনতাসীর মামুনের *শান্তি কমিটি : ১৯৭১*। ৪৫০ টাকা দাম। কেনার ক্ষমতা নেই। গত কদিন ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছি। ৮৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়েছি। দেখি আজও কিছু পৃষ্ঠা পড়া যায় কি না।' আস্তে আস্তে কথাগুলো বলে যায় ফারহানা।

'তুই তো ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী। *শান্তি কমিটি : ১৯৭১* পড়ে তুই কি করবি ?' সৈকত বলে।

'যে কারণে আজকে মানববন্ধনে এসেছি, যে কারণে পাগলের মতো হঠাৎ বেসুরো আওয়াজ তুলেছি—মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা চাই, সে কারণে।'

'তোর সব কথা বুঝে উঠতে পারি না ফারহানা। তবে এইটুকু বুঝি তোর ভেতরে কষ্টের বড় একটা ঢেলা আছে।'

'তুই ঠিকই ধরেছিস, ওই ঢেলা যখন আমার ভেতরে ওলটপালট খায়, তখন আমি বেদিশে হয়ে পড়ি। বর্তমানকে ভুলে যাই।' বিষণ্ন গলায় ফারহানা বলে।

ওরা দুজন বাতিঘরে ঢোকে। ফারহানা সংকুচিতভাবে তাক থেকে মুনতাসীর মামুনের বইটি টেনে নেয়।

সৈকত কাউন্টারের দিকে সরে আসে। চাপা গলায় বলে, 'মুনতাসীর মামুনের *শান্তি কমিটি ১৯৭১* বইটি প্যাকেট করে দেন।' সৈকত তাকিয়ে দেখে—গভীর মনোযোগ দিয়ে ফারহানা বইটির পৃষ্ঠা উল্টিয়ে যাচ্ছে।

একটা সময়ে ফারহানা পড়া থামায়। অসহায় ভঙ্গিতে এদিক ওদিক তাকায়। বইটি যথাস্থানে রেখে সৈকতের উদ্দেশ্যে বলে, 'যাইরে সৈকত।'

'দাঁড়া, আমিও যাব।' বলে সৈকত।

চমকে সৈকতের মুখের দিকে তাকায় ফারহানা। মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করে, 'তুই কোথায় যাবি ?'

'এই হাঁটব, তোর সঙ্গে একটু। আপত্তি নেই তো তোর ?' থতমত কণ্ঠে বলে সৈকত।

এবার হেসে উঠল ফারহানা।

'হাসছিস কেন ?' জিজ্ঞেস করে সৈকত।

হাসতে হাসতে ফারহানা বলে, 'তোর ভঙ্গি দেখে মনে হলো—রাজাগজা যেন আমি। আমার সঙ্গে হাঁটতে পারমিশন লাগবে!'

BanglaBook.org

এবার সৈকতও ফিক করে হেসে দেয়, 'রাজাগজা না রানিটানি। তুই আবার রাজা হবি কী করে? হলে রানি হবি।' কৌতুকের ঝিলিক সৈকতের চোখেমুখে।

ফারহানার মুখমণ্ডল থেকে হাসি বিলীন হয়ে যায়। বেদনার গভীর একটা ছায়া পড়ে সেখানে। ছোট্ট একটা শ্বাস টেনে ফারহানা বলে, 'চল, হাঁটি।'

বাতিঘর থেকে বেরিয়ে ডিসি হিলের উত্তর পাশ ধরে লাভলেইনের দিকে হাঁটতে থাকে দুজনে।

ফুটপাতের ধার ঘেঁষেই ফুলের দোকানগুলো। ফুলগুলো রাখা হয়েছে ফুটপাত জুড়ে। ফুটপাতচারীরা কখনো স্তূপিকৃত ফুলের ওপর দিয়ে ছোট্ট একটি লাফ মেরে, কখনো ফুটপাত থেকে নেমে, কখনো বা শরীরের নানা অংশ বেঁকিয়ে পথ ফুরাচ্ছে। ফুলের দোকান ছাড়িয়ে একটু এগোলেই 'চট্টগ্রাম মঞ্চে'র বিলবোর্ড। ওখানকার ফুটপাত ফাঁকা। ওখানে পৌঁছেই সৈকত ভূমিকা না করে বইয়ের প্যাকেটটি ফারহানার দিকে এগিয়ে ধরে। বলে, 'নে এটা।'

'কী এটা?' অবাক চোখে জিজ্ঞেস করে ফারহানা।

'বই। তোর জন্যে।'

'আমার জন্যে! কী বই?'

'শান্তি কমিটি ১৯৭১।'

থমকে দাঁড়ায় ফারহানা। কী যেন ভাবে একটুক্ষণ। তারপর ম্লানমুখে বলে, 'আমি এ বই নেব নারে সৈকত।'

'কেন নিবি না! তোর প্রিয় বই তো!' সৈকত বলে।

'তারপরও নেব না। তুই কেন এত দামি বই আমাকে উপহার দিবি?'

শান্ত গলায় সৈকত বলে, 'আমি কোনো ধনী ঘরের সন্তান নইরে ফারহানা। বাপ গোয়ালা। গৃহস্থদের কাছ থেকে দুধ কিনে গঞ্জে নিয়ে বেচে। ওই দিয়ে আমাদের সংসার চলে। এসএসসি পাস করে শহরে আসি। রেজাল্ট খারাপ ছিল না। সিটি কলেজে ভর্তির সুযোগ পাই। এইচএসসি পাস করে অনার্স, তারপর এমএসসি পড়ছি বোটানিতে। মেসে থাকি। টিউশনির টাকা দিয়ে চলি। কাল সন্ধেয় টিউশনির টাকা পেয়েছি। ওই টাকায় কিনেছি বইটি। বইটি নিলে খুশি হব।' আগ্রহী চোখে ফারহানার দিকে তাকিয়ে কথা শেষ করে সৈকত।

ফারহানা কিছু বলে না। সৈকতের দিকে কৃতজ্ঞ চোখে একটুক্ষণ তাকায়। বইটি হাত বাড়িয়ে নেয়। তারপর দুজনে পাশাপাশি চুপচাপ হাঁটতে থাকে।

মোমিনরোড লাভলেইনে মেশার আগে ঝাউতলা। চট্টগ্রামে ঝাউতলা দুটো। বোঝার সুবিধার জন্যে মানুষেরা এই ঝাউতলাকে মেথরপট্টি ঝাউতলা বলে। এখানে একটি মেথরপট্টি আছে, সে অনেককাল আগে থেকে। মেথরপট্টির আশপাশে খোলা নিচু জলো জায়গা ছিল। ওই নিচু জায়গার একাংশে গড়ে উঠল বস্তি। হুলস্থুল করে মানুষ

BanglaBook.org

বেড়ে গেল চট্টগ্রাম শহরে। মেথরপট্টি ঘৃণার হলেও তার আশপাশে দুমদাম করে বড় বড় বিল্ডিং গজিয়ে উঠল। ধনীরা থাকতে শুরু করল ওইসব বিল্ডিংয়ে। ওরা রিকশাওয়ালা, টেক্সি ড্রাইভারকে গন্তব্যের ঠিকানা বলতে শুরু করল ডিসি হিল ঝাউতলা।

ভূমিলোভীরা অনেক চেষ্টা করল বস্তি আর পট্টিকে উচ্ছেদ করতে। কিন্তু সম্ভব হলো না। নিম্ন আয়ের মানুষগুলো বস্তিতে থাকে। পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করে। কিন্তু অস্তিত্বে টান পড়ল যখন, সবাই এককাট্টা হলো। ভূমিদস্যুরা পিছিয়ে গেল। মেথরপট্টি আর বস্তি থেকে গেল। ওই বস্তিরই দু' কামরার একটা ঘরে ফারহানারা থাকে। ফারহানারা মানে ফারহানা, তার বাপ শামসু আর মা নীলু বেগম।

সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার বারহাল ইউনিয়নে শামসুর বাড়ি ছিল। বারহাল ইউনিয়নের মধ্যদিয়ে দুর্বাসা নদী বয়ে গেছে। বাংলাদেশের অসংখ্য নদীর মধ্যে দুর্বাসা একটি। মানচিত্রে নির্দেশিত না হলেও স্থানীয়দের মনোচিত্রে খোদাই করা আছে এই নদী। প্রচণ্ড ক্রোধপরায়ণ মুনি ছিলেন দুর্বাসা। রেগেমেগে একে তাকে অভিশাপ দিতেন শুধু। নামের সঙ্গে মিলের কারণে বোধহয় নদী দুর্বাসাও ক্ষেপা ধরনের। শুধু কূল ভাঙে। আজ এপার তো কাল ওপার। বারহাল ইউনিয়নের চরখানপুর গাঁয়ের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া দুর্বাসার দক্ষিণ পাড়ে শামসুর বাড়ি ছিল। শামসুর বাপ ছিল চাষি। চার পাঁচ কানি জমি ছিল তার। উঁচু ভিটে ছিল। ভিটের ওপর মাটির ঘর ছিল। শামসুর বাপ নিজের জমির সঙ্গে আরও দু'-চার-পাঁচ কানি বর্গা জমি মিশিয়ে চাষ করত। ধানে আর রবিশস্যে বছর চলে যেত। অভাব ছিল না ঘরে। শামসুর বয়স কুড়ি পেরোতে না পেরোতেই নীলু বেগমকে পুতের বউ করে আনল শামসুর বাপ।

শামসুর আবেগ ছিল খুব। ভালো গান গাইতে পারত । লেখাপড়া তেমন জানত না। কোনোরকমে নাম সই করতে পারত। যুদ্ধ শুরু হলে এক সন্ধেয় শামসু বাপকে বলল, 'বাবা, আমি যুদ্ধেত যাইতাম। মুক্তি যুদ্ধেত।'

বাপ বলে, 'কিথা কছ, ঘরের মাঝে নয়া বউরে থুইয়া তুই যুদ্ধেত যাইতে কিথারলাগি ?'

'বাবা, তুমি ত ঘরো আছও। মাও আছইন ঘরও। নীলুরে আমি বুঝাইয়া কইমু।'

চরখানপুর ছাড়িয়ে গোটা বারহাল ইউনিয়ন, বারহাল ইউনিয়ন ছাড়িয়ে জকিগঞ্জ উপজেলায় এ সংবাদ চাউর হয়ে গেল—শামসু বুলেবা মুক্তিযোদ্ধা ওইছে। রাজাকার আর পাঞ্জাবিদের মারবার লাইগা হাতত্ অস্ত্র নিছে।

চরখানপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বশিরউদ্দিন। তারই সভাপতিত্বে চরখানপুরে শান্তিকমিটি গঠিত হলো। বশিরউদ্দিনের নেতৃত্বে একটা রাজাকার দলও গঠিত হলো। বশির জকিগঞ্জ উপজেলায় গিয়ে চরখানপুর গ্রামটা ঘুরে যাওয়ার জন্যে মেজর ফয়সল খানকে অনুরোধ করে এল। মেজর ফয়সল খান চরখানপুরে এলে বশিরউদ্দিন শামসুর বাড়ি দেখিয়ে বলল, 'স্যার, ইটা মুক্তিযুদ্ধার বাড়ি। ই বাড়ির

BanglaBook.org

পোলা শামসু হারামজাদা যুদ্ধেত গেছে।' থেমে বড় করে একটা শ্বাস টানল। তারপর দুই হাতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, 'আহারে! আল্লায় জানে ওই হারামখোর এর মাঝে কজন পাঞ্জাবি খুন করছে!'

মেজর ফয়সল খান দাঁত কড়মড় করে বলল, 'আগ লাগাও শালা বেহেনচোদ হারামি কো মোকাম মে।'

রাজাকাররা আগ লাগাতে গিয়ে শামসুর বাপকে ধরল। মা বউ নীলু বেগমকে নিয়ে পাটক্ষেতে আত্মগোপন করল। ফয়সল নিজ হাতে গুলি করল শামসুর বাপের কপাল বরাবর। তার সামনেই আগুন দেওয়া হলো শামসুর বাড়িতে।

পাকঘর পুড়ল, বসতবাড়ি পুড়ল। গরু-ছাগলগুলো রাজাকাররা নিয়ে গেল। এর কিছু গেল মিলটারি ক্যাম্পে, বেশিরভাগ গেল বশিরউদ্দিনের গোয়ালে। সব পুড়লেও শামসুদের গোয়ালঘরটি পুড়ল না। মিলিটারি রাজাকাররা চলে গেলে নীলু আর শামসুর মা পাটক্ষেত থেকে বেরিয়ে এল। উদ্ভ্রান্ত চোখে দুজনেই দেখল—উঠানে শামসুর বাপ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। কপালের গুলি মাথার পেছনটা উপড়ে বেরিয়ে গেছে। মাথার চারপাশে জমাট বাঁধা কালচে রক্ত।

প্রতিবেশী জলিল মাস্টারের সহায়তায় শামসুর বাপকে কোনোরকমে কবরে নামিয়ে দিয়ে শামসুর বউটাকে বুকে বেঁধে গ্রাম ছাড়ল শামসুর মা। পাঁচ গ্রাম পর শামসুর মায়ের বাপের বাড়ি। সেখানেই ঠাঁই নিল বউ-শাশুড়ি।

তারপর অপেক্ষার পালা। মাস ফুরায়—মে-জুন-জুলাই-আগস্ট। দিন যায়, নদী কাছে আসে। দুর্বাসা দক্ষিণপাড় ভাঙতে ভাঙতে শামসুর বাড়ির একেবারে কাছ ঘেঁষে ভাঙন থামায়। গ্রামবাসীরা বলে, একটু জিরিয়ে নিচ্ছে করালগ্রাসী দুর্বাসা। বাড়িঘর, ধানিজমি, গাছপালা, পুকুর-ডোবা, আলপথ-মেঠোপথ খেতে খেতে উদরপূর্ণ হয়ে গেছে দুর্বাসার। একটু বসে ঢেঁকুর তুলছে সে। উদরস্থ খাওয়া হজম হয়ে গেলে আবার ভাঙন শুরু করবে।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর পেরিয়ে ডিসেম্বর এল। ১৬ ডিসেম্বর সূর্য উঠল, বিজয়ের। শামসুর মা বউকে নিয়ে ওইদিনই চরখানপুরে ফিরল। যদি শামসু ফিরে আসে! গোয়ালঘরের কাঠামোটা আছে; ভাঙাচোরা বেড়া, চালের স্থানে স্থানে ফুটো হয়ে গেছে। কত ফলন্ত গাছ ছিল ভিটেয়! সব লুটপাট হয়ে গেছে। বাড়ির উত্তর কোনার তালগাছটি শুধু দাঁড়িয়ে আছে। বড় একটা বটগাছ ছিল। ডালপালা কেটে নিয়ে গেছে কারা। কাণ্ডটা নিয়ে কবন্ধের মতো দাঁড়িয়ে আছে বটগাছটি।

বশিরউদ্দিন গা ঢাকা দিয়েছে। লোকমুখে শোনা যায়—সুনামগঞ্জের বিল এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে সে। দাড়িগোঁফ কেটে, বাবরিচুল ছেঁটে লেবাস বদলে ফেলেছে সে। যুদ্ধের সময় চরখানপুরে বশিরউদ্দিন অত্যাচার চালিয়েছে ভীষণ। গরু-ছাগল নিয়ে গেছে যখন ইচ্ছে, যার গোয়াল থেকে ইচ্ছে। সালামত আলীর চৌদ্দ বছরের মেয়েকে মেজর ফয়সল খানের ক্যাম্পে চালান দিয়েছে। একটেরে ছিল

BanglaBook.org

নাপিতপাড়া। নির্জীব, নির্বীর্য কিসিমের মানুষ তারা। বশিরউদ্দিনের উস্কানিতে রাজাকারদের অত্যাচার বেড়ে গেলে অধিকাংশ নরসুন্দর সপরিবারে গ্রাম ত্যাগ করেছে। দু'-একটি পরিবার মাটি কামড়ে থেকে গেছে। কোথায় যাবে, কী খাবে এই অনিশ্চয়তায় তারা গাঁ ছেড়ে যায় নি। তাদের মধ্যে বিমল শীলের পরিবার একটি। টিনের বাক্স নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘোরে বিমল, দু'-চার-দশজনের চুল ছাঁটিয়ে যা পায় তা দিয়ে সংসার চালায়। পথে একদিন বশিরউদ্দিনের সঙ্গে বিমলের দেখা। মাথা নিচু করে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলে বশির হুংকার দিয়ে উঠল, 'কিথারে মালাউনের পুত, চোখে দেখছ না ? আদাব-সালাম না দিয়া পাশ কাটাইয়া যাইতাছছ ? তুই জানছ না আমি ক্যাটা ?'

'জি হুজুর জানি। আদাব হুজুর।' কোঁতা হয়ে বিমল বলল।

'তোর আদাবের মাইরে চুদি। চোদানির পোলা, তুই বেশি বাইড় বাইড়া গেছত ? বাঁশঝাড়ের ওই বাঁশটা দেখছত ? আইখ্যাওয়ালা মোটা বাঁশটা দেখতাছত না—ইটা তোর পোন্দে দিয়া যাঁইতা হারাইয়া দিমু পুঙ্গির পুত। খাড়ো মালাউনের বাইচ্চা, তোরে দেখাইতাছি।' চোখ পাকিয়ে মেজাজ গরম করে কথাগুলো বলল বশিরউদ্দিন।

চুল কাটার সরঞ্জামভর্তি টিনের বাক্সটা পাশে নামিয়ে রেখে বিমল শীল দুই হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'ভুল অইছে হুজুর, মাফ কইরা দেইন।'

বিমল শীলের কাঁচুমাচু ভঙ্গি দেখে তখন আর কিছু না করলেও শুক্রবারের দুপুরে রাজাকারের দল নিয়ে নাপিতপাড়ায় বিমলের উঠানে হাজির হলো বশিরউদ্দিন। বিমল, তার বউ, দুই সন্তান, বিমলের বুড়া বাপ—সবাইকে নিয়ে মসজিদে গেল। সেদিন জুমার নামাজের পর গোটা পরিবারকে মুসলমান করা হলো। বিমলের ছোট দুই ছেলের সুন্নত করানো হলো। বিমলের মুসলমানি নাম রাখ হলো ইজ্জত আলী। ইজ্জত আলী মাথায় টুপি পরে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরল।

বশিরউদ্দিনের এইসব কর্মকাণ্ড গ্রামবাসী ভোলে নি। ভোলে নি বলেই ১৬ ডিসেম্বর তার সন্ধান করা হয়েছে। কিন্তু বশির ধুরন্ধর। ১৬ ডিসেম্বরের দু' দিন আগে রাতের আঁধারে সে চরখানপুর ছেড়েছে।

শামসু যথাসময়ে ফিরে এল না। যারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা ফিরল। যারা প্রত্যন্ত গ্রামে মিলিটারি-রাজাকারের ভয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা ফিরল। কিন্তু ফিরল না মুক্তিযুদ্ধে যাওয়া শামসু। শামসু মরে গেছে না বেঁচে আছে ভিনগাঁয়ের মুক্তিরাও বলতে পারল না। শামসুর মা ভেঙে পড়ল, 'ও আমার পোলারে, তুই আমরারে ছাইড়া কোয়াই গেলে রে পুত। ইবায় আমরা কিলা বাঁচমু। কিথা খাইমুরে বাবা।'

নীলু বেগমের প্রাণ শক্ত। সে ভেঙে পড়ে না। শামসুর না-ফেরার বেদনা নীলুর আশাকে দুমড়ে দিতে পারে না। দিন যায় মাস যায়, নীলু আশায় পথ চেয়ে থাকে। মাস তিনেক পরে নীলু বেগমের পথ চাওয়া শেষ হয়। ক্র্যাচে ভর দিয়ে শামসু বাড়ি

BanglaBook.org

ফিরে। তার ডান পা হাঁটুর নিচ থেকে কাটা। মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে এক অপারেশনে খানসেনার হাতে ধরা পড়ে শামসু। ডান পায়ে গুলি করে তারা। মৃত ভেবে চলে যায় খানরা। পরে মুক্তিযোদ্ধারা মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে সীমান্তের ওপারে নিয়ে যায়। সেখানকার হাসপাতালে গত চার মাস চিকিৎসা নেয় শামসু। সুস্থ হয়ে ক্র্যাচে ভর দিয়ে বাড়ি ফিরে।

দিন যায়; সপ্তাহ, মাস, বছরও যায়। শামসু তার ঘরবাড়ি আগের মতো করে আর বানাতে পারে না। বাপ বুড়ো হয়ে গেলেও গায়ে শক্তি ছিল, মাথায় বুদ্ধি ছিল। ক্ষেতখামারে শামসুর সঙ্গে হাত লাগাত। বুদ্ধির গুণে এক টাকাকে দুই টাকা করতে পারত। বাপ চলে যাওয়ায় শামসু ভীষণ অসহায় হয়ে গেল। ক্র্যাচে ভর দিয়ে চাষাবাদ তো আর করা যায় না! শামসুর পরিবার-ঘরবাড়ি হতশ্রী হতে লাগল। এর ওর কাছ থেকে চেয়েচিন্তে খাওয়ার মতো অবস্থা দাঁড়াল শামসুর। জমি বেচা শুরু করল সে। একদিন শেষ খণ্ড জমি বেচে একটি গাভিন গাই কিনে আনল। যদি দুধ বেচে সংসার চলে!

স্বাধীনতার বছর পাঁচেক পরে বশিরউদ্দিন ফিরে এল। সাড়ম্বরেই ফিরল সে। তখন বাতাস অনুকূলে। যুদ্ধাপরাধীরা সমাজে সম্মান পেতে শুরু করেছে। বশিরউদ্দিন ফিরেই বাজারের চাতালটা পাকা করে দিল। জামে মসজিদের ছাদ ঢালাইয়ে এক শ' বস্তা সিমেন্ট দিল। তার বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়া মেটে রাস্তাটায় ইট বসাল। চারদিকে বশিরের জয়জয়কার। দানখয়রাতের বহর দেখে চরখানপুরের মানুষেরা যুদ্ধের সময় তার কৃতকর্মের কথা বেমালুম ভুলে গেল। সবাই ভুললেও ভুলল না শুধু শামসু আর ইজ্জত আলী। বশিরের সঙ্গে দেখা হলে এ দুজনের গলায় কফ আসে। সেই কফ ওরা থু বলে বশিরের সামনে ফেলে।

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন হলো। আলহাজ্ব মোহাম্মদ আমিন হেরে গেল বশিরউদ্দিনের কাছে। বশির চরখানপুরের মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হলো যে, আলহাজ্ব মোহাম্মদ আমিন ভারতের দালাল। যুদ্ধের সময় আমিন সপরিবারে ভারতে চলে গিয়েছিল।

বশিরউদ্দিন শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান থেকে পুনরায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হয়ে গেল।

শামসুর গ্রামে টিকে থাকা মুশকিল হয়ে গেল। বশিরই তার জীবনকে অস্থির করে তুলল। রাতে শামসুর ঘরের চালে ঢিল পড়তে লাগল। মাঠ থেকে কে বাছুরটা চুরি করে নিয়ে গেল। রাস্তা ভরাটের নামে শামসুর বসতবাড়ির সীমানা ঘেঁষা খাসজমি থেকে বশিরউদ্দিন গভীর খাদ করে মাটি কাটাল। বর্ষায় ভিটের একাংশ ভেঙে পড়ল ওই খাদে। অসহায় শামসু এর ওর কাছে গেল সুরাহার জন্যে। কিন্তু কেউ বশিরের বিরুদ্ধে এগিয়ে এল না। শামসুর অপরাধ—ক্র্যাচে ভর দিয়ে সে মোহাম্মদ আমিনের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ঘুরে আমিনের জন্যে ভোট চেয়েছিল।

BanglaBook.org

দুর্বাসা আবার জেগে উঠল। শামসুর বাড়ির উত্তর সীমানায় ঢুকে পড়ল দুর্বাসা। ঝড়জলের এক রাতে দুর্বাসা এক গ্রাসে শামসুর বাড়িটা গিলে ফেলল। শামসু বউকে নিয়ে সেই আঁধার রাতে ঘর থেকে বের হয়ে আসতে পারল। মা নদীর পেটে গেল। দু দিন পর বউকে নিয়ে সর্বস্বান্ত শামসু রেলস্টেশনে উপস্থিত হলো। শামসুর গাভীটা বশিরের গোয়ালে ঠাঁই পেল। সেরাতে দড়ি ছিঁড়ে নদীর গ্রাস থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিল গাভীটি।

এক সন্ধেবেলা চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে নামল শামসু। তার বগিটা ছিল শেষের দিকে। নেমে দেখল—লোহার ওভারব্রিজ। বউকে নিয়ে আঁধারে সামনের দিকে পা বাড়াতে সাহস করল না শামসু। ব্রিজের নিচে ঘুপচি জায়গাটিতে গুটিসুটি মেরে রাতটা কাটিয়ে দিল শামসুর পরিবার।

পরদিন সকালে লাঠির গুঁতায় ঘুম ভাঙল শামসুদের। 'হালার পুত, বাইর হ' গালি শুনতে শুনতে শামসু ঘুপচি জায়গাটি থেকে বেরিয়ে এল। তার পেছনে নীলু বেগম। নজমুল গলায় বিষ মিশিয়ে বলল, 'আরে লেইঙ্গাইয়া, হারা রাইত মাইয়াপোয়া বুগত্ লই কাডাইয়ছ। ক'টিয়া দিয়ছ মাগিরে।'

শামসু নজমুলের কথার মানে বুঝল না। শুধু বুঝল মাগি শব্দটি। আর রাগী চোখমুখ দেখে বুঝল—লোকটি খারাপ কিছু বলছে। তারপরও শান্ত স্বরে শামসু বলল, 'কিথা কওরে বাই?'

'তোর কিথা কওরের মারে চুদি। বাইর হ।' নজমুল চোখ লাল করে গর্জন করে উঠল।

শামসু মারে চুদি শব্দ দুটোর মানে বুঝল। মুখে কোনো কথা বলল না। শুধু ক্র্যাচটা দিয়ে নজমুলের পেটে জোরসে একটা গুঁতা দিল।

'ওরে মারে' বলে ধপাস করে বসে পড়ল দারোয়ান নজমুল।

নজমুলের আর্তচিৎকার শুনে আশপাশ থেকে দু'-চারজন কুলি ও যাত্রী এগিয়ে এল। এল সিগন্যালম্যান বদরুল।

বদরুল জিজ্ঞেস করল, 'কী হইছে নজমুল?'

'আমি কইরাম' বলে ক্র্যাচে ভর দিয়ে এগিয়ে এল শামসু। তারপর সংক্ষেপে জকিগঞ্জ থেকে রেলস্টেশনে নামা, ঘুপচি জায়গায় সপরিবারে রাত কাটানো আর নজমুলের অশালীন ব্যবহার—এসব খুলে বলল।

তারপর গলা উঁচিয়ে বলল, 'মুক্তিযোদ্ধা আমি। একাত্তরে যুদ্ধেত গেছলাম।' এরপর নজমুলের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, 'এই ক্র্যাচ দিয়া যেমন আমি পথ চলি, পথও পরিষ্কার করি এই ক্র্যাচ দিয়া।'

জড়ো হওয়া মানুষগুলো ধীরে ধীরে সরে পড়ল। বদরুল বলল, 'নজমুল, এরা অসহায় মানুষ। বিপদে পড়ে রাতটা কাটাইছে পুলের নিচে। এদের ওপর অত্যাচার করা তোমার উচিত হয় নাই। তুমি যাও এখান থেকে।'

BanglaBook.org

বদরুল নজমুলের উপরস্থ কর্মচারী। নজমুল কটমট করে শামসুর দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর ধীর পায়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

সেদিন থেকে বদরুলের সঙ্গে শামসুর ভাব হয়ে গেল। বদরুলের বোনকে পাঞ্জাবিরা তুলে নিয়ে গিয়েছিল। পাঞ্জাবিদের যারা শায়েস্তা করেছে শামসু তাদের একজন। বদরুল শামসুকে বলল, 'তুমি আর এক দুই রাত থাকতে পারবে এখানে। আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি। কিন্তু তার বেশি না। বড়সাহেব জানতে পারলে অসুবিধা হবে। এর মধ্যে তুমি অন্য কোথাও ব্যবস্থা করে নাও।'

সজল চোখে শামসু বলল, 'ঠিক আছে বাই।'

সেই থেকে শামসু থেকে গেল বটতলিতে। টাইগারপাস ওভারব্রিজের নিচে একটা ঝুপড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিল বদরুল। পাশের ঝুপড়ির সেহেলির মায়ের সহযোগিতায় সিটি কলেজের এক অধ্যাপকের বাসায় ঝিয়ের কাজ পেল নীলু বেগম।

ডানপা-হীন শামসু একদিন চট্টগ্রাম রেলস্টেশনের প্লাটফরমে এল। ওভারব্রিজের নিচে জড়সড় হয়ে বসে পড়ল। মাথা নিচু করে ডান হাত সামনে প্রসারিত করে সর্বস্বান্ত কপর্দকহীন শামসু বলল, 'একটা টেকা দিয়া যাওকা বাই, বাত খাইতাম।'

একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা শামসু ভিক্ষুক হয়ে গেল। যে শামসুর মুখ দিয়ে একসময় বেরোত—'জয় বাংলা', সে শামসু এখন বলছে—'একটা টেকা দিয়া যাওকা বাই।' শামসু নিরুপায়। কী করবে সে ? কী করারই বা আছে তার ? তার একটা পা নেই। সে সামর্থ্য হারিয়েছে। দুর্বাসা তার ভিটে কেড়ে নিয়েছে। বশির তার বাপকে খুন করিয়েছে, পাঞ্জাবি লেলিয়ে তাকে সর্বস্বান্ত করেছে। রাজাকার লিডার বশিরউদ্দিন গাঁয়ে নতুন করে ক্ষমতার আসনে বসেছে। জান এবং মান বাঁচাবার জন্যে শামসু গাঁ ছেড়েছে। এখানে এসে জান বাঁচল, মান গেল।

দিন যায়, বছর যায়। এমনি করে অনেকটা বছর ফুরিয়ে গেল শামসুর জীবন থেকে। বহু বছর পর তার একটা মেয়ে হলো। নাম রাখল ফারহানা। ফারহানা বড় হতে থাকল। চার থেকে পাঁচ, পাঁচ থেকে ছয়। ফারহানাকেও একদিন শামসু নিয়ে আসে রেলস্টেশনে। ফারহানা কখনো পাশে বসে বাপের সঙ্গে কণ্ঠ মিলায়—একটা টেকা দিয়া যাওকা, কখনো প্লাস্টিকের বোতলে করে চা আনে। যেদিন দুটো টাকা বেশি জোটে, শামসু শিঙাড়া আনায়। ফারহানা মেয়ের হাতে দিয়ে বলে, 'খা বেটি খা।'

কোনো কোনো দিন আমড়া খাওয়ার আবদার করে ফারহানা। শামসু একটা টাকা ফারহানার হাতে দিয়ে বলে, 'যারে মা, একটা আমড়া কিনিয়া আন।' একদিন কাঁদতে কাঁদতে ফিরে ফারহানা। তার ডান গালে যেন কিসের দাগ। মোচড়ানো বুকে শামসু জিজ্ঞেস করে, 'কীথা অইছেরে বেটি ? কান্দের কিয়ল্লাগি ?'

ফারহানা সজল চোখে বলে, 'ও বেটা আমার গালে কামড় দিছে।'

BanglaBook.org

'ক্যাটায় রে ? কোন পুঙ্গির পুত কামড় দিছে ?' বসা থেকে উঠতে গিয়ে ডান দিকে ঢলে পড়ল শামসু। ফারহানা ক্র্যাচ এগিয়ে ধরল।

দাঁড়িয়ে শামসু চাপা স্বরে আবার জিজ্ঞেস করল, 'ক্যাটা ? কেমনে এই কাম করল ?'

'চা আনতাম গেছলাম তারেইক্যার দোকানো। ওই যে দাড়িওয়ালা বেটা—আমারে ভিতরে ডাকি নিয়া ডান গালো কামড় দিল। আমিও ওই বেটার নাকো জুরে একখান কামড় বোয়াই দিছি।' চোখের পানি মুছতে মুছতে ফারহানা বলল।

শামসু হঠাৎ করে শান্ত হয়ে গেল। মাথা নিচু করে কী যেন ভাবল। তারপর নাক দিয়ে বাহির থেকে জোরে বাতাস টেনে নিল। মেয়ের দিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে বলল, 'তুই ই কিথা কছগো মাই ? আমার লগে আয়তো, দূর থেইক্যা আমারে ওই হারামজাদারে দেখাই দিবে।'

মেয়ের হাত ধরে তারেকের দোকানের দিকে গেল শামসু। কালামকে দেখিয়ে ফারহানা বলল, 'বাবা, ওই বেটা...।' মেয়ের মুখে হাত চাপা দিল শামসু। নোংরা কথা মেয়ের মুখ থেকে আর শুনতে চায় না সে। মেয়েকে বলল, 'তুই একটু আউগ্যা। একটা রিকশারে খাড়া করা। আমি আইয়ার।' বলে তারেকের চা-দোকানের দিকে হন হন করে এগিয়ে গেল শামসু।

শামসু কালামের মাথা বরাবর একটা জোর বাড়ি দিল ক্র্যাচ দিয়ে। 'আল্লারে' বলে মাটিতে পড়ে গেল কালাম। 'কী হয়েছে, কী হয়েছে' বলে সবাই ভেতরের ঘরে এগিয়ে গেল। এই ফাঁকে শামসু সটকে পড়ল সেখান থেকে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে মেয়ের ঠিক করা রিকশায় উঠে পড়ল শামসু। রিকশাওয়ালাকে বলল, 'একটু চালাইয়া যাওবা, আমরার কাম আছে।'

রিকশায় যেতে যেতে শামসু চাপা গলায় মেয়েকে বলল, 'এরে, হুনগো মাই, আজকোর কথা তোর মাইরে কইছ না। তোর মাই হুনলে দুখ পাইবো।'

পরদিন শামসু আর বটতলি স্টেশনে গেল না। দু দিন ঝিম মেরে ঝুপড়িতে বসে থাকল।

নীলু বেগম জিজ্ঞেস করল, 'কই তোমারতান এখন কিথা অইলো। ভিক্ষা করতে যাওনা ক্যানে ?'

স্ত্রীর প্রশ্ন শুনেও কোনো জবাব দিল না শামসু। কাজে যাওয়ার তাড়া থাকায় নীলু তার প্রশ্নটি আর দ্বিতীয়বার করল না। তৃতীয় দিন সকালে শামসু মেয়েকে নিয়ে বেরোল। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ গেইটের সামনে শামসুর ভিক্ষুকজীবনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হলো।

এক রাতে নীলু বেগম বলল, 'স্যারে আমারে কইছুইন তোমার পুরিরে পড়াওনা কিথার লাগি ?'

অন্যমনস্ক শামসু বলল, 'কোন স্যারে কইছইন ?'

BanglaBook.org

‘ওউ আমরার জসিম স্যার আর কি। আমি যে ঘরও কাম করিয়ার।’

‘কিথা কইছইন কইলায় ?’ শামসু নীলুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল এবার।

‘তুমি কিথা চিন্তা কর ? আমি কিথা কই তুমি বুঝলায় নানি ?’ নীলু বেগম জিজ্ঞেস করে।

শামসু বলল, ‘আমি তো পুরির কথা চিন্তা করিয়ার। পুরি তো সিয়ান হইরো। ই বস্তিত আমরা কিলা থাকমু ?’ তারপর দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলল শামসু। নীলু বেগম দেখল—কী যেন একটা লুকাচ্ছে শামসু। তার চোখমুখ, তার গোটা চেহারা কী এক গভীর বেদনায় বিষণ্ন।

‘তোমার কিথা অইয়ে আমারে ঠিক কইরা কও তো। কুনু ভেজালো পড়ছনি তুমি ?’ আচমকা জিজ্ঞেস করে নীলু।

‘না না, কুনতা অইছে না।’

মুখে কিছুই হয় নি বললেও শামসুর অভিব্যক্তি কিন্তু তার কথাকে সমর্থন করে না। তারপরও শামসু নিরুপায়। মেয়ের অপমানের কথা কী করে বাপ হয়ে স্ত্রীকে বলবে! কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে সে একথা বলবে যে ফুলের মতো নিষ্পাপ মেয়েটির ডানগালে কালাম শুয়োরের বাচ্চা লালসার কামড় বসিয়েছে! বাবা হয়ে সে এ অপমান সহ্য করেছে, ক্র্যাচের বাড়ি দিয়ে কালামকে জানিয়েও দিয়েছে তার প্রতিবাদের ভাষা। কিন্তু নীলু বেগম তো মা! মেয়ের এ অপমানের কথা জানলে সে মর্মঘাতী হবে। তাকে তা জানানো যাবে না। কিন্তু যখনই সেদিনের কথা মনে পড়ে, বুকটা আনচান করে উঠে শামসুর। যে দেশের মাটির পবিত্রতার জন্যে সে জান কবুল করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, যে দেশের স্বাধীনতার জন্যে তার ডান পা চিরতরে হারিয়েছে, সেই পবিত্র মাটিতে তার মেয়েটি লাঞ্ছিত হলো! এর চেয়ে বড় অপমান তার জন্যে আর কী হতে পারে! মাথার রগ টনটন করে উঠল। অনেক কষ্টে শামসু নিজেকে দমন করে রাখল। হাসি হাসি মুখ করে বলল, ‘আমরা তো গরিব মানুষ। পুরিরে কিলা পড়াইমু ? পড়ালেখা করাইতে টেকা লাগে নানি ?’

‘জসিম স্যার কইছইন—তাইন সব ঠিক কইরা দিবা। তোমার কুনতা চিন্তা করন লাগত না।’ ব্যগ্র হয়ে নীলু বেগম বলল।

শামসু কিছু বলল না। উদাসীন চোখে চেরাগের টিমটিমে আলোয় নীলুর দিকে তাকিয়ে থাকল।

সে বছর জানুয়ারিতে জসিম স্যার ফারহানাকে ভর্তি করিয়ে দিল স্কুলে, রেলওয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

সেই-ই শুরু। ফারহানা আর থামে নি।

বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই ফারহানা বাবার মুখে একটু একটু করে শুনেছে মুক্তিযুদ্ধের কথা, যুদ্ধে বাবার বীরত্বের কথা। সে যখন আরও বড় হলো, তখন শুনল—বশিরউদ্দিনের অত্যাচারের কথা, তার দাদার হত্যার কথা। পঁচাত্তরের

BanglaBook.org

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে বশিরদের ক্ষমতা দখলের কথা শামসু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে গেছে ফারহানার কাছে। এই বশিরউদ্দিনের চক্রান্তে শামসু সর্বহারা হয়েছে, গ্রাম ত্যাগ করে পথের ভিখিরি হতে বাধ্য হয়েছে—এসব কথা শামসুর কাছে শুনেছে ফারহানা। শুনে শুনে তার ভেতরে প্রচণ্ড ঘৃণা কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠেছে। পিতার কষ্ট এবং পরিবারের অপমানের দৃশ্যগুলো সে নিজের মধ্যে তৈরি করে নিয়েছে। সেই কল্পিত দৃশ্যগুলো যখন তার চোখের সামনে দিয়ে একের পর এক ভেসে যায়, সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অদেখা বশিরউদ্দিনের একটা ছবি সে নিজের মধ্যে কল্পনা করে নেয়। মনে মনে সেই ছবিতে থুতু ছিটায়, যখন তখন।

একটা সময়ে ওভারব্রিজের বস্তিতে টেকা মুশকিল হয়ে উঠল শামসুদের। আশপাশের ঝুপড়ির মাথা তোলা ছাওয়ালরা চুরিচামারি করে, রেলস্টেশনের ঘুপসি-ঘাপসি এলাকায় ছোটখাটো ছিনতাই জোচ্চুরিও করে। কেউ কেউ ছুটকোছাটকা কুলিগিরি করে। মেয়েরা পিঠে বস্তা ঝুলিয়ে প্লাস্টিকের বোতল, ছেঁড়া জুতা, কাগজের টুকরো—এসব কুড়িয়ে যায় সারা দিন। কেউ কেউ মায়েদের সঙ্গে বাসাবাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতে যায়। শামসুর বউ নীলু বেগম বাসাবাড়িতে কাজ করতে গেলেও তার মেয়ে ফারহানা যায় স্কুলে। এ নিয়ে টিটকারি-উপহাসের শেষ নেই। আশপাশের মানুষদের মধ্যে ঈর্ষাও কাজ করে প্রবলভাবে। নানা কটূকাটব্য শুনতে শুনতে শামসুরা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ঠিক এই সময়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

ফারহানা তখন ক্লাস এইটে পড়ে। দুপুরছুটিতে ভাত খেতে এসেছে ঘরে। সকালেই রান্না করে যায় নীলু বেগম। দুপুরে বাপ ভিক্ষায়, মা ঝিগিরিতে। মাথা নিচু করে ডালের সঙ্গে ভাত মাখছে ফারহানা। ওই সময় পাশের ঝুপড়ির সিরাজের বাপ ঘরে ঢোকে। ঝাপটে ধরে ফারহানাকে। মাটিতে চেপে ধরার আগে পানিভর্তি গ্লাস দিয়ে সিরাজের বাপের কপালে আঘাত করে ফারহানা। 'অ—মারে' বলে দ্রুত ঝুপড়ি থেকে বের হয়ে যায় সিরাজের বাপ। কপাল ফাটে না, কিন্তু আস্ত একটা সুপারি জেগে উঠে তার কপালে।

অনেকক্ষণ ঝিম ধরে বসে থাকে ফারহানা। হঠাৎ করে ছোটবেলার চা-দোকানের দাড়িওয়ালা লোকটির কথা মনে পড়ে যায় ফারহানার। ওই সময় লোকটির কামড়ের অর্থ তেমন করে বোঝে নি সে। কিন্তু আজ পুরুষচরিত্রের সবকিছু সে বুঝে গেল। একবার মনে হলো—বাপ-মা ফিরে এলে আদ্যপ্রান্ত খুলে বলবে। কিন্তু তার চোখের সামনে বাবার সেই দিনের মর্মাহত চেহারা ভেসে উঠল। বাপের ওই বেদনাময় অসহায় চোখ তাকে দীর্ঘদিন তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। না, মা-বাপকে বলা যাবে না আজকের লাঞ্ছনার কথা। সে ঠিক করল—আজকের ঘটনার বিন্দুবিসর্গও মা-বাবাকে জানাবে না। জানালে শুধু দুঃখ বাড়বে মা-বাবার। হয়তো সিরাজের বাপের সঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়বে তারা। চার-পাঁচটা পোলা সিরাজের বাপের। যদি মারামারি লাগে, তাহলে পঙ্গু বাপ তার পড়ে পড়ে মার খাবে। তার চেয়ে কিল খেয়ে কিল হজম করে যাওয়া ভালো।

সে রাতে ঘুম আসে নি ফারহানার। মা-বাবার পাশে শুয়ে চোখের দু' পাতা একত্র করতে পারে নি সে। চক্রাকারে বারবার এক পলকের দেখা সিরাজের বাপের লোভী চোখ তাকে গিলে খেতে চাইছিল। মনের মধ্যে গভীর একটা ব্যথা চনমনিয়ে উঠল। বলল, 'বাবা তুমি হজাগ আছনি ?'

শামসুর বলে, 'অয়গো মাই। তুই কুনথা কইবিনি আমারে ?'

'বাবা, আমি ইখানো আর থাকতাম পারতাম না। আইয়ো আমরা আর কুনুখানো যাইগি।' বিষণ্ন গলায় ফারহানা বলে।

নীলু বেগম বলে, 'ক্যানে গো মাই ? কিথা অইছে তোর ? আমারে ক' তো তুই।' বিছানায় উঠে বসে নীলু বেগম।

মায়ের প্রশ্নের কোনো জবাব দেয় না ফারহানা। অন্ধকারে বাপের দিকে তাকিয়ে থাকে শুধু।

দীর্ঘক্ষণ শামসু কথা বলে না। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে—কোনো একটা কিছু হয়েছে। এমন একটা কিছু ঘটেছে, যা মেয়ে তাকে বলতে চাইছে না। অথচ অসহনীয় যন্ত্রণায় ভেতরে ভেতরে কাতরাচ্ছে সে।

অনেকক্ষণ পরে শান্ত কণ্ঠে শামসু বলে ওঠে, 'আমরা ইখান থাইক্যা এমনি যাইমু গিয়াগো মাই। জলদি যাইমু গো মাই।'

ঝাউতলার বস্তিতে বাসা ভাড়া নিল শামসু। বস্তিওয়ালারা জানে না শামসু কী কাজ করে; শুধু জানে—শামসুর বউ নীলু বেগম কোনো এক কলেজের প্রফেসরের বাসায় কাজ করে।

এভাবে চলে গেছে অনেক দিন, অনেকটা বছর। এসএসসি, এইচএসসি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে ফারহানা। টিউশনি শুরু করার পর বাবার ভিক্ষা করা বন্ধ করিয়েছে। বলেছে, 'বাবা, আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। মুক্তিযোদ্ধা ভিক্ষা করে জীবন কাটাল। আর না বাবা। আমি আয় করছি। মা আর আমার আয় দিয়ে কোনোভাবে আমাদের চলে যাবে।'

শামসুর এখন কোনো কাজ নাই। প্রতিদিনের বাঁধাধরা ভিক্ষাবৃত্তি থেকে সে এখন মুক্ত। সকালে ভেতরটা খলবলিয়ে ওঠে। মুখ দিয়ে নিজের অজান্তে বেরিয়ে আসে, 'একটা টেকা দিয়া যাওকা বাই।' নিজেকে সংযত করে। মেয়ে যায় ইউনিভার্সিটিতে, বউ যায় বাসার কাজে। শামসু বসে বসে যুদ্ধের কথা ভাবে, পা হারানোর কথা ভাবে, বশিরউদ্দিনের কথা ভাবে। যেদিন লালদীঘির ময়দানে বা শহীদ মিনারের চত্বরে জনসভা হয়, ক্র্যাচে ভর দিয়ে সেদিন ওইসব সভায় যায় শামসু। দূরে দাঁড়িয়ে নেতাদের ভাষণ শোনে। প্রলাপ বকে নেতারা। মিথ্যের আবরণ দিয়ে সত্যকে লুকানোর চেষ্টা দেখে, অহেতুক আস্ফালন দেখে ঘৃণায় গা রি রি করে শামসুর। একদলা থুতু মাটিতে ফেলে সে। তারপর হাঁটতে থাকে সামনের দিকে।

BanglaBook.org

আজ এমএ-র রেজাল্ট বের হয়েছে। ফারহানা পাস করেছে। সৈকত বলল, 'চল, তোকে আমি পরোটা মাংস খাওয়াব। দারুল কাবাবে চল।'

'কেন তুই আমাকে মাংস পরোটা খাওয়াবি ?'

'তুই পাস করেছিস, তাই ?'

'তুই পাস করিস নি।'

'হ্যাঁ, করেছি।' আমতা আমতা করে বলল সৈকত।

'তাহলে আমি খাওয়াব না কেন তোকে ?' সৈকতের চোখে চোখ রেখে বলল ফারহানা।

'না, বলছিলাম কি—আমি, আমি টিউশনির টাকা পেয়েছি।'

'আমিও তো পেয়েছি। চল তো সৈকত, আমি আজকে তোকে খাওয়াব। না করিস না তুই।' ব্যগ্র গলায় ফারহানা বলল।

দারুল কাবাবের সামনের চত্বরে দুজনে মুখোমুখি বসল। খাবারের অর্ডার দিয়ে দুজনেই চুপচাপ বসে থাকল।

সৈকত হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা ফারহানা, মুনতাসীর মামুনের *শান্তি কমিটি: ১৯৭১* বইটা বিষয়ে এত আগ্রহ কেন তোর ?'

ফারহানা কোনো জবাব দেয় না। উদাস চোখে দূরের সেগুনগাছটির দিকে তাকিয়ে থাকে। সৈকত অপেক্ষা করতে থাকে ফারহানার জবাবের জন্যে।

'তুই আমার প্রকৃত পরিচয় জানিস না। জানাতে চাইও নি আমি কোনোদিন। পরিচয় দেওয়ার মতো আমার তেমন কিছু নেই।' বলে হঠাৎ করে চুপ মেরে যায় ফারহানা।

যেমন হঠাৎ কথা বলা বন্ধ করেছিল, তেমনি হঠাৎ আবার কথা বলা শুরু করল ফারহানা, 'আমার বাসায় তুই কখনো যেতে চাস নি; অবশ্য যেতে চাইলেও তোকে কোনোদিন আমার বাসায় নিতাম না।'

'কেন ?' আলতো করে জিজ্ঞেস করে সৈকত।

'কারণ আমার বাবা ভিক্ষুক আর মা কাজের বেটি।' দূরের বাতাসে ভুর করে সৈকতের কানে কথাগুলো ভেসে এল।

চমকে ফারহানার দিকে তাকাল সৈকত। ফারহানা বলে যেতে লাগল, 'আমাদের একটা ছোট্ট গ্রাম ছিল, একটা নদী ছিল, চড়ুইডাকা দুপুর ছিল, পুকুর ছিল, গোয়াল ছিল। সবকিছু বাবাকে হারাতে হয়েছে।' তারপর গলায় উন্মাদনা ঢেলে ফারহানা বলল, 'আমার বাপ মুক্তিযোদ্ধা ছিল। বাবা যুদ্ধে যাওয়ার অপরাধে পাঞ্জাবিরা দাদাকে হত্যা করেছে। ঘরে আগুন দিয়েছে বশিরউদ্দিন।'

'বশিরউদ্দিন কে ?' উদ্‌গ্রীব কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে সৈকত।

BanglaBook.org

'তার জন্যেই তো আমার *শান্তি কমিটি ১৯৭১* **খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া।** **বশিরউদ্দিন** চরখানপুরের শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান। ও **বিমলকে ইজ্জত আলী** বানিয়েছে। পাঞ্জাবিদের নিয়ে এসেছে গ্রামে। আমাদের উঠানেই **আমার দাদাকে গুলি করিয়েছে।** তার জন্যেই আমার বাবা পা হারিয়েছে।'

সৈকত ত্বরিত জিজ্ঞেস করল, 'পা হারিয়েছে মানে?'

আমার বাবার ডান পা নেই। যুদ্ধে পাঞ্জাবিরা গুলি করে আমার বাবার পা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। বশিরউদ্দিনদের মতো মীরজাফরেরা যদি পাঞ্জাবিদের দোসর না হতো, আমার বাপকে যুদ্ধে যেতে হতো না। ঢাকা থেকেই ফিরে যেতে বাধ্য হতো ওই হায়েনার দল। যুদ্ধে না গেলে আজকে আমাকে ভিক্ষার টাকা দিয়ে বড় হতে হতো না।' তারপর একটু দম নিল ফারহানা। ধীরে ধীরে বলল, 'মামুন স্যার দেশের নানা জেলার শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানদের নামের তালিকা দিয়েছেন তাঁর বইতে। মামুন স্যারের ওই বইতে বশিরউদ্দিনের নাম আছে কি না দেখেছি। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়ে গেছি, কিন্তু বশিরউদ্দিনের নাম খুঁজে পাই নি। তুই আমাকে বইটা দেওয়ার পর আরও ভালোভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছি আমি। বশিরউদ্দিনের নাম নেই ওই বইতে।'

টেবিলে খাবার এলে মৃদু কণ্ঠে সৈকত বলে, 'খা।'

খাবারের দিকে নজর না দিয়ে ফারহানা বলে, 'আমি ছাড়ব না। আমি মুনতাসীর মামুন স্যারের সঙ্গে আমার বাবাকে নিয়ে দেখা করব। বাবার মুখ দিয়ে দাবি জানাব—ওনার বইটিতে যাতে বশিরউদ্দিনের নাম অন্তর্ভুক্ত করেন।'

'তাতে তোর লাভ!' সৈকত খাবার মুখে তুলে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করে।

ফারহানা সৈকতের কথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলে, 'ওই দিন যে আমি মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা চাই, দিতে হবে বলে চিৎকার দিয়ে উঠেছিলাম, এখন তার কারণ তুই নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিস।' তারপর কঠোর কণ্ঠে বলল, 'বশিরউদ্দিনের নাম বইটিতে অন্তর্ভুক্ত করাতে পারলে আমার ব্যক্তিগত কোনো লাভ হবে না সত্যি, কিন্তু এইটুকু লাভ তো হবে—দেশের একজন আসল শত্রুর নাম দেশবাসী জানতে পারবে। বশিরউদ্দিন নামের কোলাবরেটরের উদ্দেশে একদলা থুতু ছিটাবে।'

তারপর মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে ফারহানা বলে, 'এ দেশে বড় বড় যুদ্ধাপরাধীর বিচার হচ্ছে। আমি, আমার বাবা, আমার মা অপেক্ষা করে আছি—একদিন না-একদিন কুখ্যাত শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানদের বিচার হবে। তখন ওইসব চেয়ারম্যানের তালিকা দরকার হবে। মুনতাসীর স্যারের বইটির দরকার হবে তখন! ওই বইতে বশিরউদ্দিনের নাম থাকলে তারও বিচার হবে। ফাঁসি হবে তার।' বলতে বলতে কেঁদে দিল ফারহানা।

সৈকত তার বাঁ হাত দিয়ে ফারহানার ডান হাতটি স্পর্শ করল।

BanglaBook.org

হৃদয়কথা

বয়স আমার ষাট। সরকারি চাকরি করতাম। এখন রিটায়ার করা জীবন আমার। বাড়ি আছে শহরতলিতে। শহরের মাঝখানে দু' কাঠা জমিও আছে। গাড়ি কিনব কিনব করছি। ভর ভরন্ত সংসার। আমার চারদিকে পুত্রকন্যারা। আমার স্ত্রীর বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেলেও তার শরীরের বাঁধন এখনো অটুট। ফর্সা রঙ তার, চামড়ার মসৃণতা অন্য নারীর মনে হিংসা জাগায়। চুল আমার ধবধবে সাদা। আমার স্ত্রীর মাঝে মধ্যে দু'-এক গাছি চুল পাকলেও বুয়াকে দিয়ে ত্বরিত মূলোৎপাটন করে। স্ত্রীর পাশে নিজেকে বড় বুড়ো বুড়ো মনে হয়।

আমার সব কিছু আছে, কিন্তু কী যেন নেই। ভরা আনন্দের সময়েও মন খচখচিয়ে ওঠে, কী যেন এক গভীর অতৃপ্তি আমার মনকে চঞ্চল করে তোলে। চেহারায় বোধহয় এই চাঞ্চল্যের প্রভাব পড়ে। মাঝে মাঝে আমার স্ত্রী জিজ্ঞেস করে, 'তোমাকে এত অস্থির লাগছে কেন ? শরীর কি খারাপ করেছে ?'

আমি মুখ ফিরিয়ে ঢোঁক গিলে বলি, 'কই না তো ?'

স্ত্রী প্রসঙ্গান্তরে যায়। মা-বাবার পছন্দের মেয়েটিকেই বিয়ে করেছিলাম আমি। গত পঁয়ত্রিশ বছর ও সোহাগে আর যত্নে আমাকে ভরিয়ে রেখেছে। স্নানে নিজ হাতে গরম জল এগিয়ে দিয়েছে, রাতের বেলা মাথায় তেল ঘষে দিয়েছে। ভালো রান্নাগুলো আমার পাতে তুলে দিয়ে পরম তৃপ্তি পেতে দেখেছি তাকে। তারপরও আমার ভেতরে সুখ নেই। একটা গভীর বেদনাকে আমি আমার মধ্যে গত পঁয়ত্রিশ বছর লালন করে আসছি। এই বেদনার কথা আমি কাউকে বলতে পারি নি। কাকে বলব ? পুত্র-কন্যা-স্ত্রী কাউকে বলা যাবে না এ কষ্টের কথাটি। তাহলে যে সংসারে বিপর্যয় ঘটবে। দীর্ঘ দিন নিজের সঙ্গে নিজে যুদ্ধ করতে করতে রক্তাক্ত হয়েছি। অনেক অনেক বছর অভিনয় করে গেছি স্ত্রীর সঙ্গে, পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে। আর পারছি না আমি। আমার বেদনার কথা কারও সঙ্গে শেয়ার করতে না পারলে আমার মানসিক অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। তাই ঠিক করেছি এই শেষবিকেলে জীবনের আলোকময় সকালের কথাগুলো একটু লিখে জানাব। এতে হয়তো আমার অপরাধবোধ কমবে। যাকে নিয়ে আমার উজ্জ্বল সকাল জড়ানো, সে যদি আমার এ লেখাটি পড়ে, তাহলে অনেক অভিমানের ভেতরে থেকেও সে আমাকে ক্ষমা করার ব্যাপারটি একটু করে হলেও হয়তো ভেবে দেখবে।

এইচএসসি পাস করার পর নরসিংদী সরকারি কলেজে বাংলা বিভাগে ভর্তি হয়েছিলাম। ত্রিশজন ছাত্রছাত্রী নিয়ে সেবারই প্রথম অনার্স ক্লাস শুরু হয়েছিল বাংলা

BanglaBook.org

বিভাগে। আমাদের ক্লাসে ছেলের চেয়ে মেয়ের সংখ্যা বেশি। আমরা জনাপাঁচেক ছেলে ছিলাম। হাসান, রফিক, সুখেন্দু চক্রবর্তী, দোর্দণ্ডপ্রতাপ বড়ুয়া আর আমি। আমি হিমাংশু দাশ। আমার পদবি দাশ হলে কী হবে, আসলে আমরা ছিলাম শীল। পদবি পাল্টালেও জাতপেশা থেকে গিয়েছিল আমাদের। গ্রামের বাজারে চুলকাটার দোকান ছিল আমাদের। বাবা সেখানে ক্ষৌরকর্ম করত। ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করার বেদনায় সময়সময় জড়সড় হয়ে থাকতাম আমি। হাসান-রফিক-সুখেন্দু শহরেরই ছেলে। দোর্দণ্ড শহরতলি থেকে এলেও ইচড়েপাকা ছিল সে। তার সমস্ত ভাবনা আর আলোচনার বিষয় ছিল নারী-পুরুষের শরীর। রফিক খুব পড়ুয়া ছিল। তার হাতে সর্বদা পাঠ্যবহির্ভূত বই থাকত। হাসান বাঁ হাতে সিগারেট গুঁজে কী যেন ভাবত সব সময়। সুখেন্দু ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান। অন্যের কীভাবে উপকার করা যায়—এই চিন্তায় মশগুল থাকত সে। আর আমি ? মাটির গন্ধ গায়ে মেখে গ্রাম থেকে উঠে এলে একজন তরুণের যে অবস্থা হয়, আমারও অবস্থা সে রকম।

মেয়েদের মধ্যে শরিফা খলবলিয়ে কথা বলত। রেশমা ভালো নাচতে পারত; কোনোরকমে ক্লাস শেষ করে সে নাচের ক্লাসে চলে যেত। নাবিলা ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে গুনগুনিয়ে গান করত। কস্তুরি ছিল সংসারমগ্ন। এসএসসির পর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল তার। সন্তান-স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ি—এসবের ভেতরে থেকেও সে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছিল। তার চোখেমুখে সংসার-ক্লান্তির ছাপ। সহপাঠীদের মধ্যে আরেকজন ছিল, সে মাধবীলতা দত্ত। বেঞ্চের শেষ প্রান্তে বসত। সে ছিল ভীষণ রকমের চুপচাপ। উজ্জ্বল শ্যামলা রঙ তার, মাঝারি হাইট। চোখ দুটো অলৌকিক, মায়া মায়া। অধর প্রশস্ত, সামান্য ঝুলানো। ওই অধরেই নারীর সকল সৌন্দর্য এবং পুরুষের সকল কামনা যেন জড়ো হয়ে ছিল।

সুখেন্দুর চোখ পড়েছিল মাধবীলতার ওপর। ক্লাসে আমার পাশেই বসত সুখেন্দু। শিক্ষকের লেকচারের ফাঁকে ফাঁকে কোমল চোখে মাধবীর দিকে তাকাত সে। মাধবী তখন গভীর মনোযোগে শিক্ষকের কথা শুনতে মগ্ন। অন্যসময়ে মাধবীর আশপাশে ঘুর ঘুর করত সুখেন্দু। মাধবীকে জিজ্ঞেস করত, 'আজ স্যার ক্ষেত্রগুপ্তের যে বইটির কথা বললেন, ওটি তোমার কাছে আছে ? না থাকলে আমি তোমাকে দিতে পারি। আমার কাছে আছে।' অথবা 'আগামী সপ্তাহে তো মেঘনাদবধ কাব্যের প্রমীলা চরিত্রের ওপর টিউটোরিয়াল পরীক্ষা, নোটটা তৈরি করেছ কি তুমি ? না করলে আমি সাহায্য করতে পারি ?'

মাধবী স্মিত হেসে বলত, 'দাদা, বইটি আমার কাছে আছে। আর নোটটি আমি বেশ কিছুদিন আগে রেডি করেছি।'

ম্লান মুখে সুখেন্দু ফিরে আসত। আমাকে বলত, 'দেখছস, দেমাক দেখছস ? বলে—সাহায্যের দরকার নেই। বলে কি জানস ? আমি নাকি দাদা!'

BanglaBook.org

আমি উসখুসে মুখে সুখেন্দুর দিকে তাকাতাম। সুখেন্দু আমাদের মধ্যে সবচাইতে মেধাবান। দীর্ঘদেহী। তবে তার চেহারায় একটি অগুণ ছিল। বয়স্ক না হয়েও বয়সের একটা ছাপা তার সমস্ত অবয়বে ছড়িয়ে ছিল। তার চেহারায় দাদা দাদা একটা ভাব ছিল। তাই ক্লাসের প্রায় সব মেয়ে তাকে দাদা বলে সম্বোধন করত। এটা আবার সুখেন্দুর সহ্য হতো না। রাগী কণ্ঠে বলত, 'দাদা কেন? প্রেমিক হওয়ার যোগ্যতা কি আমার নেই?'

সেদিন মাধবীর দাদা সম্বোধন শুনে এসে আমার পাশে বসল সুখেন্দু। চাপা স্বরে বলল, 'দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা। দাদা ডাকার লেসন দিচ্ছি।'

সুখেন্দুর হস্তাক্ষর ছিল ভীষণ সুন্দর। তার সুন্দর হাতের লেখার জন্যই শুধু তাকে ভালোবাসা যেত।

সপ্তাহখানেক কেটে গেল। একদিন সিঁড়িতে দেখা মাধবীর সঙ্গে। আমার সামনে একটুক্ষণ যেন থমকে দাঁড়াল মাধবী। আমার ভুলও হতে পারে। এটা যে ভুল নয় পরের দিন টের পেলাম। সেদিন শেষ পিরিয়ড শেষ হওয়ার পর হইহই করে প্রায় সবাই ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল। মাধবী আমার সামনে এসে দাঁড়াল। সাদা একটি খাম এগিয়ে দিয়ে চোখে চোখ রেখে বলল, 'খুব সাহসী তুমি।' বলেই ক্লাসের বাইরে চলে গেল মাধবী।

আমি কাঁপা হাতে খামটি ধরে সেই নির্জন ক্লাসরুমে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তারপর প্রায় ধপাস করে বেঞ্চে বসে পড়লাম। গ্রামের ছেলে আমি। শহুরে হালচালের সঙ্গে খুব ভালো করে পরিচিত হয়ে উঠি নি। বুকটা ধড়ফড় করতে লাগল। এ কিসের খাম? মাধবী কেনই বা বলল, খুব সাহসী তুমি।

বেশ কিছুক্ষণ পর বুকের কাঁপন থামলে খামটি খুলি আমি। দেখি ভেতরে একটি চিঠি। কোনো সম্বোধন নেই। সরাসরি লেখা—তোমাকে দেখতে ভেজা বেড়ালের মতো মনে হলেও, দুঃসাহসী তুমি। সরাসরি চিঠি দিলে তুমি আমাকে! তাও আবার প্রিয় মাধবী বলে! মুখে তো তেমন করে গুছিয়ে কথা বলতে পার না। তোমার জিহ্বায় এবং আচরণে গ্রামীণতা জড়ানো। কিন্তু চিঠি তো লিখেছ বেশ খাসা! এমন অসাধারণ সুন্দর হাতের লেখা তোমার! আহা! তোমার হাতের লেখার অর্ধেক সুন্দরও যদি আমার লেখা হতো! কালকে ছুটির পর থেকে যেয়ো, কথা আছে।

কী আশ্চর্য! আমার হাতের লেখা আবার সুন্দর হলো কখন? কোনোরকমে আমার হাতের লেখা বোঝা যায় মাত্র। লেখা তো সুন্দর সুখেন্দুর! আর আমি কখন মাধবীকে চিঠি লিখলাম! কোনো মেয়ের দিকে ভালো করে তাকানোর সাহসটি পর্যন্ত নেই যার, তার আবার চিঠি লেখা! বড় দ্বিধায় পড়ে গেলাম আমি। মাধবীর চিঠির মর্মার্থ বুঝতে পারলাম না। দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে ভুগতে বাড়ি ফিরলাম আমি।

BanglaBook.org

পরদিন সেমিনার কক্ষের সামনে কাঁধে বিরাট একটা থাপ্পড় খসিয়ে সুখেন্দু বলল, 'কিরে হিমাংশু, কেমন লাগছে তোর ? তোর মুখের রঙ তো পালটে গেছেরে ?'

'মানে ?' নিচু স্বরে বললাম।

'মানে, মানে কিরে বেটা ? চিঠির উত্তর পাস নি ?' চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করল সুখেন্দু।

এতক্ষণে আমার কাছে সবকিছু খোলসা হয়ে গেল। তাহলে চিঠি সুখেন্দুই লিখেছে মাধবীকে, আমার নাম দিয়ে! আমি সুখেন্দুকে টানতে টানতে ক্যানটিনে নিয়ে গেলাম। চা-শিঙাড়ার অর্ডার দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সুখেন, ঘটনাটা খুলে বল তো ভাই।'

চা খেতে খেতে সুখেন্দু যা বলল তার মর্মার্থ—চিঠির ইতিতে আমার নাম ব্যবহার করে প্রেমের চিঠি গছিয়েছে সে মাধবীকে। দাদা ডাকার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে একাজ করেছে। চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে সুখেন্দু বলল, 'দত্তের এবার দেমাক ভাঙবে।' সুখেন্দু আমার জাতপাতের বিষয়টি জানত।

এরপর আমাদের অন্যরকম একটা জীবন শুরু হয়ে গেল। আমাদের মানে আমার আর মাধবীর। ক্লাস ফাঁকি দেওয়া শুরু হলো আমাদের। আজকে মেঘনা নদীর পাড়ে তো, পরশু চৈতন্যার বনে। কখনো সকালের ট্রেনে বসে পড়া; ঘোড়াশাল স্টেশনে নেমে এধার ওধার ঘোরা। অন্য সহপাঠিনীরা সেলোয়ার-কামিজ পরলেও শাড়ি পরত মাধবী। শাড়িতে তাকে অসাধারণ লাগত। তাকে ঘিরে আমার অলৌকিক স্বপ্ন দানা বাঁধতে থাকত। আমাদের এ ভালোবাসাবাসিতে শরীর ছিল না। একটু হাত ধরাধরি, একটু কাছ ঘেঁষে বসা—এই-ই ছিল আমাদের প্রেম। ক্লাসমেইটরা আড়েঠারে তাকাত আমাদের দিকে। আমাদের প্রেমের ব্যাপারটি ডিপার্টমেন্টে চাউর হয়ে গিয়েছিল। দু'-একজন শিক্ষকের কানেও যে গেছে, তা টের পেয়েছিলাম পরে।

বিভাগ থেকে রাঙামাটিতে বনভোজনে যাওয়া হলো একবার। প্রায় এক শ'জন ছাত্রছাত্রী আর পাঁচ-সাতজন শিক্ষকশিক্ষিকা। রাঙামাটিতে আমরা একটু আড়াল খুঁজছিলাম। দু'-চারটা গাছ পেরিয়ে একটু সামনে গেছি মাত্র দুজনে, অমনি সিরাজ স্যারের কণ্ঠ শোনা গেল, 'কিরে, কোথায় যাও দুজনে ? দূরে যেয়ো না। আসো আসো।'

তখন আমরা থার্ড ইয়ারে ওঠে গেছি। বাংলা বিভাগের দেয়ালপত্রিকায় আমার একটি কবিতা ছাপা হলো। কবিতার বিষয়বস্তু তেমন বিশেষ কিছু না। সিরাজ স্যার খুব জ্বালাতেন আমাদের। সাদা চুল দাড়িতে মেহেদি লাগাতেন তিনি। কবিতায় তাঁকেই টার্গেট করলাম আমি। লিখলাম—

চুল দাড়ি পাকিয়াছে, মন পাকে নাই,
মনে যার থাকিবার, সে তো থাকে নাই;
তাই চুল দাড়ি পাকিয়াছে মন পাকে নাই।

ইত্যাদি।

BanglaBook.org

স্যারের চোখে পড়েছিল কি না জানি না, কিন্তু বিভাগের নানা ইয়ারের ছাত্রছাত্রীদের নজর কেড়েছিল কবিতাটি। একদিন ফার্স্ট ইয়ারের একজন ছাত্রী এগিয়ে এসে কবিতাটির খুব তারিফ করল। আমি মিষ্টি হেসে সৌজন্য দেখালাম। আমি সরে গেলাম তার কাছ থেকে। কিন্তু নাদিয়া ইয়াসমিন আমার পিছু ছাড়ল না। কারণে অকারণে আমার সামনে এসে দাঁড়াতে লাগল। তার কাছ-ঘেঁষে দাঁড়ানো, ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলা—এসব কিছুতে ভুল বোঝাবোঝির সৃষ্টি হলো। সবচেয়ে বেশি ভুল বুঝল মাধবী।

একদিন মাধবী বলে ফেলল, 'এসব কী হচ্ছে?'

আমি বললাম, 'কী বিষয়ে বলছ তুমি?'

'ওই যে নাদিয়া ইয়াসমিন, তার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলার প্রয়োজন কী?' বলল মাধবী।

আমি অবাক চোখে তার দিকে তাকালাম। দেখলাম—তার চোখেমুখে সন্দেহ আর ঘৃণার মাখামাখি। আমি দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, 'ও কবিতা ভালোবাসে। মাঝে মাঝে কবিতা নিয়ে আলোচনা হয়। এ ছাড়া তো বেশি কিছু না।' তারপর স্পষ্ট গলায় বললাম, 'তুমি কি আমাকে সন্দেহ করো?'

'সন্দেহ নয়। কানাঘুষা চলছে ডিপার্টমেন্টে। নানারকম নোংরা কথা কানে আসছে। তুমি স্পষ্ট করে নাদিয়াকে বলে দাও যাতে ও আর তোমার সঙ্গে না মেশে।' মাধবী বলল।

আমি খুব আহত হলাম। মাধবী এ-কী বলছে! এত নিবিড় ভালোবাসা তার সঙ্গে আমার! বিশ্বাসের ওপর আমাদের ভালোবাসা দাঁড়ানো বলে এত দিন আমি বিশ্বাস করতাম। কিন্তু মাধবীর আজকের কথাতে তো তা প্রকাশ পাচ্ছে না। ভেতরটা আমার জ্বলে যেতে লাগল। আমাদের ভালোবাসার অপমানে আমি মর্মাহত হলাম।

একধরনের ব্যথা আর ক্রোধ আমার মধ্যে চাগিয়ে উঠল। আমি বললাম, 'অযথা সন্দেহ কোরো না। ভালোবাসার অপমান কোরো না।'

নাদিয়ার কানেও বোধ হয় কানাঘুষার কথাটি গিয়েছিল। তার হয়তো জেদ চেপে গিয়েছিল, নইলে কেন সে আরও বেশি করে আমাকে আঁকড়ে ধরল? এরপর থেকে সে আমার চারপাশে আরও বেশি করে ঘুর ঘুর করতে লাগল। ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলতে লাগল।

নাদিয়া যত কাছে এল, মাধবী তত দূরে সরে গেল। নাদিয়াকে আকারে ইঙ্গিতে বার কয়েক বললাম আমার সঙ্গ ছাড়তে, কিন্তু সে আরও বেশি করে সাপে ব্যাঙ গিলার মতো করে আমাকে গিলতে লাগল। মাধবীকে বোঝালাম। ও শুনে দূর থেকে আরও দূরে সরে যেতে লাগল। একটা সময়ে সে আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিল। ধীরে ধীরে ওর এবং আমার মধ্যে কঠিন একটা দেয়াল তৈরি হয়ে গেল।

আমরা একই ক্লাসে পড়ি। কিন্তু কারও দিকে কেউ তাকাই না। এমনি করে দুজনে একটি নদীর দু' পাড়ের বাসিন্দা হয়ে গেলাম। দীর্ঘশ্বাসকে সম্বল করে থার্ড ইয়ার ফাইনাল দিলাম। কোনোরকমে সেকেন্ড ক্লাস পেলাম আমি। মাধবী ভালো পজিশন নিয়ে অনার্স পাস করে গেল।

এর মধ্যে নাদিয়া ট্রান্সফার নিয়ে জগন্নাথ কলেজে চলে গেল। তার বাবা বিদ্যুৎ বিভাগে চাকরি করতেন। তিনি ঢাকায় বদলি হয়েছেন।

রেজাল্টের পর দীর্ঘ তিন মাসের বিরতি। তিন মাস পর রেজাল্ট বের হবে, তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ শুরু করব। আমি আমার গ্রামের একটা স্কুলে পার্টটাইম শিক্ষকতা শুরু করলাম। এর মধ্যে কতবার যে ভেবেছি—এমএ পড়তে পড়তে মাধবী আর আমার মধ্যকার ভুল বোঝাবোঝির অবসান হবে। আমরা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাব।

রেজাল্টের পর এমএ পড়তে গিয়েই বিহ্বল হয়ে পড়লাম আমি। দেখি—মাধবীর হাতে শাখা, কপালে সিঁদুর।

কোনোরকমে এমএটা পাস করে বেরিয়ে এসেছিলাম আমি।

তারপর চড়াই-উৎরাইয়ের জীবন আমার। চাকরি, বিয়ে, সন্তান—এসব।

কোথায় হারিয়ে গেল মাধবীলতা! আমার কাছ থেকে অনেক দিন আগেই মাধবী নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু আমি মাধবীকে শেষ পর্যন্ত আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে পারি নি। লতার মতো এই দীর্ঘ সময় ধরে সে আমার হৃদয়কে জড়িয়ে থেকেছে। অনেক চেষ্টা করেছি মাধবীলতার মূলোৎপাটন করতে। কিন্তু আমার হৃদয় হার মানে নি।

আমি এখনো আমার স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছি। হৃদয় থেকে বারবার মাধবীকে টেনে নামিয়ে ওখানে স্ত্রীকে স্থান দিতে চেয়েছি; কিন্তু হৃদয় আমার কথা শোনে নি। ভবিষ্যতেও শুনবে কি না জানি না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সুবল জেঠা

সুবল জেঠার বাড়ি আমাদের পাড়াতে, আমাদের বাড়ির দু'-এক ঘর পরেই। স্ত্রী, দুই ছেলে আর তিন মেয়ে নিয়ে তার সংসার। অভাবের জীবন তার। নৌকা-জাল, দড়ি-নোঙর, পাল-দাঁড়—কিছুই নেই তার। থাকার মধ্যে একটা টাউঙ্গাজাল আর একটা দুইজ্যা। খাল-বিল, খাদা-ঘের-এ টাউঙ্গাজাল বেয়ে বেয়েই সংসারকে এতদূর টেনে এনেছে জেঠা। প্রতিরাতে টাউঙ্গাজাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সুবল জেঠা। সাধারণত রাতেই মাছ ধরা পড়ে বেশি। কিন্তু অভাবের পালে জোর হাওয়া লাগলে দিনেও জাল নিয়ে বের হতে হয় জেঠাকে।

ধূসর মলিন একটা ফতুয়া গায়ে দেয় জেঠা, পরনে কাদায়-মাদায় জড়ানো হাঁটুনামা ধুতি। জেঠির পরনে কখনো নতুন শাড়ি দেখেছি বলে মনে পড়ে না। পালাপার্বণে দাড়ি কাটত জেঠা। ঘন ঘন শেভ করতে অনেক টাকার শ্রাদ্ধ যে! জেঠার ছেলেমেয়েদের গায়ে-পরনে কিন্তু মলিন পুরনো জামা-প্যান্ট-সেলোয়ার-কামিজ দেখা যেত না। বড় ফিটফাট ড্রেস পরাত জেঠা তার ছেলেমেয়েদের। ভালো জামাকাপড় পরে ওরা প্রতিদিন স্কুলে যেত।

জেলেপাড়াগুলোতে এমনিতেই শিক্ষার আলোবাতাস নেই। মূল ভূখণ্ড-বিচ্ছিন্ন মহেশখালীর জেলেপাড়াটি তো আরও বেশি আদিমযুগের। দিন এনে দিন খাওয়াতে ব্যস্ত অধিকাংশ জেলেপরিবার। এ পাড়ায় দু'-চার-দশটি যে বহদ্দার-পরিবার নেই এমন নয়। তাদের বড় বড় নৌকা আছে। টঙজাল, বিহিন্দিজালে তাদের গাবঘর ঠাঁসা। মধ্যম স্তরের জেলেরা বহদ্দারদের নৌকায় গাউর হিসেবে কাজ করে। তিন মাসের চুক্তিতে এরা বহদ্দারদের নৌকায় কামলাগিরি করে। শেষ স্তরের জেলেদের সহায়সম্বল কিছুই নেই বললে চলে। হুরি বা টাউঙ্গাজালই ভরসা এদের। হুরিজাল বাইতে হয় সমুদ্রের কূলে কূলে। ঢেউয়ের ঝাপটা সহ্য করার শক্তি রাখতে হয় এসব জেলেদের। টাউঙ্গাজাল বাইতে হয় খাদা-খালে-ঘেরে। তেমন হিম্মতের দরকার নেই টাউঙ্গাজাল বাইতে। সুবল জেঠা ক্ষীণকার, ছোটখাটো। তাই টাউঙ্গাজালই ভরসা তার।

আস্তে আস্তে তার মেয়েরা মাথায় উঁচু হতে লাগল। কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ জেলেসমাজে। সুবল জেঠাও চৌদ্দ পেরোতে-না-পেরোতেই মেয়েদের টুপটাপ করে বিয়ে দিয়ে দিল। খুব যে ভালো জায়গায় বিয়ে দিতে পারল সুবল জেঠা, তা নয় কিন্তু। নিম্নবিত্তের সুবল জেঠা তার চার-পাঁচ ক্লাস পড়া মেয়েদের ঘোনারপাড়ার অর্জুন সর্দারের ছেলে, চকোরিয়ার নেতাই আর পাথরঘাটার

BanglaBook.org

পিতৃমাতৃহীন অগ্রণী ব্যাংকের ঝাড়ুদার রাখালের সঙ্গে মেয়েদের বিয়ে দিতে পেরে খুব তৃপ্তি বোধ করল। মেয়েদের বিয়ে দিয়েই জেঠা পূর্ণ দৃষ্টি দিল ছেলেদের দিকে। সুবল জেঠার বড় ছেলের নাম হীরামোহন আর সুখমোহন ছোট ছেলে।

জেলেরা বৈষ্ণব। তাদের নাম হয়—সুবল, নিতাই, গৌরাঙ্গ, কানাই ইত্যাদি। সুবল জেঠার ছেলেদের নাম কৃষ্ণপদ, চণ্ডীদাস হলে স্বাভাবিক হতো। কিন্তু জেঠা ছেলেদের নাম রাখার ক্ষেত্রে বৈষ্ণবীয় ভাবনায় প্রভাবিত হয় নি। প্রভাবমুক্ত হয়ে জেঠা তার ছেলেদের নাম রাখল হীরামোহন, সুখমোহন। একদিন জেঠাকে জিজ্ঞেসও করেছিলাম, 'ছেলেদের এরকম নাম রাখল কেন?'

জেঠা কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে থেকে গা ঝাড়া দিয়ে বলেছিল, 'আমার বড় ছেলে দেখিস একদিন অনেক বড় শিক্ষিত হবে। হীরার মতো মূল্যবান হবে সে এই সমাজে। তার জন্মের পরপরই আমি বুঝতে পেরেছি। হীরামোহনই তো সে।'

আমি কোনো প্রত্যুত্তর করি নি। শুধু ভেবেছি—জেঠার ঘরে সুখের বড় অভাব। তাই হয়তো ছোটছেলের নাম সুখমোহন রেখেছে। অন্তত সুখমোহনের নামের মাহাত্ম্যের কারণে জেঠার ঘরে লক্ষ্মীর আনাগোনা বেড়ে যাবে।

হীরামোহন সত্যিই একদিন হীরার টুকরা হতে পেরেছিল। আর সুখমোহন বাপের ঘরে সুখদেবীর আর্বিভাব ঘটাতে না পারলেও নিজের জীবনকে স্বস্তিকর জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছিল একদিন। তবে তা অনেক পরের কথা।

হীরামোহন ভালো ছাত্র ছিল। কৈবর্তবংশে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন যেন। ভালোভাবেই এসএসসি পাস করল হীরামোহন। এইট পাস করার পর সুবল জেঠাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন প্রধানশিক্ষক। বলেছিলেন, 'ডোম তোরা, গরিব মানুষ। তোর পোয়ার মাথা ভালা। সাইন্স পড়া। সাইন্স পড়াইতে খরচ বেশি। খরচ চালাইত্ পারিবি নি? সর্দার নো, বহদ্দারও নো তুই। টাউঙ্গাজাল বাই বাই ঘর চালাস। খরচের ঠেলা সামলাইত্ পারিবিনি চা।'

সুবল জেঠা সাইন্স-টাইন্স বোঝে না। তার মাথায় তখন হেডস্যারের ওই কথাটি ঘুরছে—তোর পোয়ার মাথা ভালা। হেডস্যারের এই কথাটি সুবল জেঠার বুককে ফুলিয়ে হিমালয় করে তুলল। জেঠা হেডস্যারকে বলল, 'হুজুর স্যার, আঁই মূর্খ মানুষ। আঁর পোয়ার লেখাপড়ার মাথা ভালা, হুনি আঁত্তোন কী যে ভালা লাগের। বউত্ কষ্ট গরি আঁই গত বছর আঁর ঘরর চালত্ টইন দি। পোয়ার খরচ চালাইত্ নো পাইল্যে ঘরর টইন বেচি ফেইল্যম। তুঁই শুধু আশিব্বাদ গরিবা আঁর পোয়ারে।' বলেই হেডস্যারের পা জড়িয়ে ধরতে গিয়েছিল সুবল জেঠা।

হেডস্যার তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিলেন, 'ঠিগ আছে, ঠিগ আছে। হীরামোহনেরে সাইন্সত্ পড়িবার ব্যবস্থা গরির। তুই বাড়িত্ যা, পোয়ার দিকে নজর রাখিস।'

সুবল জেঠাকে ঘরের টিন বেচতে হয় নি আর হীরামোহনের দিকে নজরও রাখতে হয় নি। প্রাইভেট টিউটর ছাড়া নিজ চেষ্টায় ভালোভাবেই এসএসসি পাস

BanglaBook.org

করল হীরামোহন। পাস দিয়ে সরকারের তরফ থেকে বৃত্তিও পেল। কক্সবাজার সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করে মেরিন একাডেমিতে ভর্তি হলো হীরামোহন। সুখমোহনও বসে থাকে নি। যে বছর হীরামোহন এইচএসসি পরীক্ষা দিল, সে বছরেই একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হলো সুখমোহন। বড় ভাইয়ের প্রভাবে সেও সাইন্স নিয়ে এসএসসি দিয়েছে।

হীরামোহন-সুখমোহন এক একটা পাস দিচ্ছে আর সুবল জেঠার আর্থিক অবস্থা জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে নানা খাতের খরচ কমিয়ে সুবল জেঠা এই দুইজনের পড়াশোনার খরচ চালিয়ে যেতে লাগল। এর মধ্যে সুখমোহন এইচএসসি পাস দিয়ে চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজে কেমেস্ট্রি বিভাগে ফার্স্ট ইয়ার অনার্সে ভর্তি হয়েছে। মনোহরখালীর সাগর সর্দারের বাড়িতে লজিং থেকে পড়াশোনা করলেও হাতখরচ, বইখাতার দাম আর টিউশন ফি কম নয়। দুই সন্তানের খরচ চালাতে গিয়ে সুবল জেঠার গলদঘর্ম অবস্থা। কিন্তু জেঠা আর জেঠির মুখে কষ্টের কোনো চিহ্ন নেই। অভাব-কষ্টকে নিজেদের চেহারা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে প্রতিবেশীদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলে জেঠা-জেঠি।

জেঠি একদিন আমার মাকে বলতে শুনলাম, 'অ ভইন, আঁরার কষ্টর দিন শেষ। ভগমানে আঁরার মিক্কে মুখ তুলি চাআর। আর বেশিদিন নাই আঁরার দুখ ঘুচি যাইবো গই। হীরামহন চাউরি গরিবো, বেতন পাইবো। আঁর পিন্দনত্ নোয়া কাওড় উডিবো। হীরামহনর বাপ হারাজীবন কষ্ট গইল্য, ঠেঙোত্তোন ফুডর দাগ নো গেল। পোয়া চাউরি পাইলে আঁরা সুগর মুখ দেইখ্যম।'

একনাগাড়ে কথাগুলো বলে দম নেওয়ার জন্য জেঠি একটু থামল। এই ফাঁকে মা মিষ্টি হেসে বলল, 'তোঁয়ার মনর বাসনা পুইন্ন হোক। আঁর ভা-ইরে গ্রীষ্ম-বর্ষা টাউঙ্গাজাল ঠেলি ঠেলি জীবন ফুরাইল।' বলতে বলতে মা পানের খিলি এগিয়ে দিল জেঠির দিকে।

ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে হীরামোহন একদিন মহেশখালীতে এল। সঙ্গে সুখমোহনও। জেঠার ঘরে চাঁদের হাসির বন্যা বইল। দুই ভাইয়ের সে কী গলাগলি ভাব! পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে যে ওরা মহেশখালীতে আসে নি এমন নয়, কিন্তু এবারের মতো বেশিদিন ওরা থাকে নি। সত্যি কথা বলতে কী, বিশেষত হীরামোহনকে এরকম উদ্বেলিতও আগে দেখি নি। আমি হীরামোহনের বয়সী। একসঙ্গে পড়ালেখাও শুরু করেছিলাম। কিন্তু হীরামোহনের মতো ভালো মাথা আমার ছিল না। তা ছাড়া, জেঠার মতন আমার বাবা তেমন বিদ্যানুরাগীও ছিল না। শুধু হীরামোহনদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে আমার যা কিছু লেখাপড়া। টেনেটুনে ডিগ্রিটা পাস করে স্থানীয় কলেজে ক্লার্কের কাজ করি। হীরামোহন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লেও আমাকে অবহেলা করত না। এবার তাকে বেশ উৎফুল্ল দেখে আমি এক বিকেলে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হীরামোহন, খুব খুশি খুশি লাগছে এবার। কোনো কারণ আছে নাকি?'

BanglaBook.org

আমরা বিকেলের দিকে আদিনাথ মন্দিরের ব্রিজে ঘুরতে গিয়েছিলাম। ব্রিজটির শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম আমরা। আমার কথা শুনে হীরামোহন বলল, 'পড়াশোনা শেষ। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরিয়ে আসব। চাকরি করব জাহাজে। দূর সমুদ্রের নীলজলে পাড়ি জমাব। ঢেউ কেটে কেটে জাহাজ এ বন্দর থেকে ও বন্দরে যাবে।' দেখলাম হীরামোহনকে কবিত্ব পেয়ে বসেছে।

আমি বললাম, 'তা তো ঠিক আছে। পড়াশোনা শেষ করার মধ্যে আনন্দ আছে। পরিবারের অভাব ঘুচাবে তুমি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে—তোমার উৎফুল্লতা শুধু এই কারণে নয়, অন্য কোনো কারণ আছে।'

হীরামোহন স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ। তারপর বঙ্গোপসাগরের নীলজলের দিকে তাকাল। কী রকম যেন একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে হীরামোহন বলল, 'তুমি সত্যি ধরতে পেরেছ। পড়াশোনা শেষ করতে পারার চেয়েও বড় একটা কারণ আছে আমার এ আনন্দের পেছনে।' বলেই সে চুপ মেরে গেল।

উদ্‌গ্রীব হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'অন্য কী কারণ ?'

হীরামোহন আর কথা বলে না। আনমনা চোখে সে আদিনাথের পাহাড় দেখতে লাগল।

আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়ার মুহূর্তে হীরামোহন নিচুস্বরে বলল, 'আমি প্রেমে পড়েছি। তবে... ।'

যে হীরামোহন মাটির দিকে চেয়ে স্কুলে যেত-আসত, যে হীরামোহন কোনো হইচই না করে ইন্টার শেষ করেছে, সে হীরামোহন বলে কী আজ!

হীরামোহন যা বলল তার সারাংশ এরকম—হেমসেন লেইনে এক রুমের একটা বাসা নিয়েছে হীরামোহন। দেশি-বিদেশি জাহাজ-কোম্পানিগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলেছে সে। মেরিন ইঞ্জিনিয়ারদের চাকরি পেতে বেশি দেরি হয় না।

খুশি মুখে সে আমাকে আরও যা জানাল—এক আঁধার সন্ধেয় নন্দনকাননের এক নম্বর গলির মুখে জটলা দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল সে। দেখল—এক রিকশাওয়ালা আরোহী দুজন নারীকে বেশ অপদস্থ করছে। আট-দশজন মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে। আরোহীদের একজন মহিলা, আরেকজন তরুণী। রিকশাওয়ালা শাঁখাপরা নারীটিকে উদ্দেশ্য করে বলছে, 'নাম্ নাম্ আঁর রিকশাত্তোন। তোরারে লই যাইতাম নো আঁই। চাই, কী গরিবি গর তো।'

মহিলাটি সাহায্য পাওয়ার আশায় জটলার উদ্দেশ্যে বলছেন, 'দেখছেন, প্রেসক্লাবের কাছে যাব বলে দশ টাকায় ভাড়া নিয়েছি আমরা। চালাতে চালাতে সে বলছে বিশ টাকা দিতে হবে। আমার মেয়ে প্রতিবাদ করায় ড্রাইভার এই রকম অসভ্যতা করছে আমাদের সঙ্গে।'

BanglaBook.org

রিকশাওয়ালা তেড়ে আসা কণ্ঠে বলছে, 'যাইতাম নো আঁই। হাঁড়ি যা তোরা।'

রিকশাওয়ালার চেহারায় কোনো মমতা নেই। নিষ্ঠুর কর্কশ কণ্ঠে সে এই দুইজন নারীকে তুই তোকারি করে যাচ্ছে। অসহায় চোখে তরুণীটি মানুষগুলোর দিকে তাকাচ্ছে।

হীরামোহন কোনো কথা না বলে সামনের মানুষদের সরিয়ে রিকশাওয়ালার চোয়াল বরাবর প্রচণ্ড একটা থাপ্পড় খসাল। নিচু স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'তুই ইতারারে প্রেসক্লাবত্ লই যাবি। আঁই লগে লগে আছি।'

সুঠাম দেহের হীরামোহনকে দেখে এবং তার থাপ্পড় খেয়ে রিকশাওয়ালা একেবারেই চুপসে গেল। নীরবে রিকশায় বসে প্যাডেল ঘোরাতে শুরু করল।

সে সন্ধেয় প্রেসক্লাব পর্যন্ত গিয়েছিল হীরামোহন। রিকশা থেকে নেমে মহিলা বলেছিলেন, 'বড় অপমান থেকে বাঁচালে বাবা।' তারপর হাত উঁচিয়ে একটা বিল্ডিং দেখিয়ে বলল, 'ওই বিল্ডিংয়ের চারতলায় থাকি আমরা।'

সেই থেকে সুপর্ণার সঙ্গে পরিচয় হীরামোহনের। সুপর্ণারা দত্ত। সুপর্ণার বাবা খাতুনগঞ্জের আড়তদার। পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা, তারপরে প্রেম। ডিগ্রি পরীক্ষা দিয়েছে সুপর্ণা।

সব শুনে আমি বললাম, 'সমস্যা তো দেখছি না কোনো। তুমি ইঞ্জিনিয়ার। সুপর্ণা গ্র্যাজুয়েট। দুজনের মধ্যে বিয়ে তো স্বচ্ছন্দে হতে পারে।'

বললাম বটে, কিন্তু এটা যে সম্ভব নয়, তা আমি হাড়েমজ্জায় জানি। আমার কাহিনি আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগের। হিন্দুসমাজ তো বৈবাহিক ক্ষেত্রে এখনো কট্টর। সে সময়ে আরও বেশি জঙ্গি ছিল। একজন জেলের ছেলের সঙ্গে একজন বর্ণহিন্দু মেয়ের সামাজিক বিয়ে ভাবাই যেত না।

কঠোর কণ্ঠে হীরামোহন হঠাৎ বলে উঠল, 'পারে না। দত্ত জলদাসে বিয়ে হওয়ার নয়।' যেমন করে বলা শুরু করেছিল, তেমনি করে কথা বলা হঠাৎ থামিয়ে দিল হীরামোহন। তার সমস্ত চোখে মুখে অপরাধবোধ খেলা করতে লাগল। তারপর সে ধীরে ধীরে বলল, 'আমি সুপর্ণাদের বলেছি—আমার নাম হীরামোহন চৌধুরী।'

আমি ফ্যাল ফ্যাল করে হীরামোহনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। বলে কি—জলদাসের পোলা চৌধুরী! কাউয়ার ময়ূরের পালক পরা!

হীরামোহন চট করে আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'এসব কথা কাউকে বলিস না ভাই। বাপ-মায়ে শুনলে বড় ব্যথা পাবে। সমাজ শুনলে নিন্দা জানাবে।'

আমি আস্তে করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে।'

এরপর হীরামোহন মহেশখালীতে যে কদিন থাকল, মনমরা হয়ে থাকল। কথা বলতে বলতে হঠাৎ আনমনা হয়ে যেত। গভীরভাবে যেন কী ভাবত। সুখমোহন বলল, 'কী দাদা, কোনো প্রোভলেম ? আমি সাহায্য করতে পারি তোমাকে ?'

BanglaBook.org

জেঠি বলল, 'অ বাছা, শরীর খরাপ গইয্যে না—? এই রইম্যা পেরেশান কা লাগের তোঁয়ারে ?'

জেঠা বলল, 'আহা! তুঁই পোয়ার কানর কাছে ঘ্যানরঘ্যানর কা গইত্যা লাইগ্যা ? চাউরি-টাউরির ব্যাপারে পোয়ারে চিন্তায় ধইয্যে পাআনলার!'

তারপর হীরামোহনের দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে জেঠা বলল, 'তুঁই চিন্তা নো গইয্য অপুত, চাউরি-বাউরির লাই একদম চিন্তা নো গইয্য। আঁই তো মরি নো যাই। আগে যেইভাবে সংসার চল্লিল, হেইভাবে সংসার চালাইয়ম। তুঁই আস্তে ধীরে চাউরির চেষ্টা গর—।' একটু থেমে জেঠা আবার অনেকটা স্বগতকণ্ঠে বলল, 'তুঁই চাউরি পাইলে আঁরার অভাব ঘুচিবো, দুঃখ ঘুচিবো। তোঁয়ার মাআর পিন্দনত্ নোয়া কাওড় উডিবো।' বলতে বলতে আনমনা হয়ে গেল জেঠা।

বাপের কথা শুনে হীরামোহনের চোখমুখ অস্থির হয়ে উঠল। দ্রুত সে বলে উঠল, 'বাবা, তুঁই চিন্তা নো গইয্য। কষ্ট গরি আঁরে পড়াইও। রাইত্-বিরাইতে ঝড় বিষ্টিত্ টাউঙ্গাজাল বাই বাই আঁরার ভরণপোষণ গইয্য, পড়ালেখার খরচ জোগাইও। হিয়ান আঁই কোনোদিন ভুইলতাম নো। চাউরি পাইলে এই সংসারর দুঃখ কষ্ট বিয়াগ্‌গিন ঘুচি যাইবো গই। হেই সমত্ তোঁয়ার টাউঙ্গাজাল বাওন বন্ধ গরি দেওন পড়িবো কিন্তুক।'

মা, বাবা, ভাই—সবাই সুখী সুখী মুখ নিয়ে হীরামোহনের দিকে তাকিয়ে থাকল।

কিন্তু হীরামোহনের চাকরি পাওয়ার পরেও সংসারের দারিদ্র্য-দুঃখ ঘুচল না, জেঠার টাউঙ্গাজাল বাওনও বন্ধ হলো না আর জেঠির পরনে নতুন শাড়িও উঠল না। তবে তা পরের ঘটনা।

সে-বার কিছুদিন পর হীরামোহন আর সুখমোহন শহরে ফিরে গিয়েছিল। মাসখানেক পর হীরামোহন চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল, সে বিদেশি জাহাজে চাকরি পেয়েছে। জাহাজে উঠার আগে অবশ্যই মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে যাবে। জেঠা পড়তে জানত না। আমিই চিঠিটা পড়ে শুনিয়েছিলাম জেঠাজেঠিকে।

এই ঘটনার দিন পনেরো পরে জেঠার কানে একটা উটকো খবর এল—হীরামোহন নাকি বিয়ে করে ফেলেছে; কোন সুভাষ না সুকান্ত দত্তের মেয়েকে নাকি হীরামোহন গত সপ্তাহে বিয়ে করেছে। খুব ধুমধামের সঙ্গে নাকি বিয়েটা হয়েছে। জেঠাজেঠি মোটেই বিশ্বাস করল না কথাটা, উড়িয়ে দিল। কিন্তু উড়িয়ে দিলে কী হবে মনতো বাগ মানছে না! পরদিন কাকডাকা ভোরে জেঠাজেঠি আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত। দুজনের চোখ গর্তে। গোটা রাত নির্ঘুম কাটানোর চিহ্ন সারা চোখেমুখে। আকুল হয়ে কেঁদে উঠল জেঠি। জেঠা আমার সামনে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। সব কথা খুলে বলার পর জেঠা মুমূর্ষু কণ্ঠে বলল, 'এখন আঁরা কী গইয্যম কও তুঁই গৌরাঙ্গ! কড়ে যাইয়ম আঁরা!'

BanglaBook.org

আমি নিম্নকণ্ঠে বললাম, 'তোঁরা অধৈর্য নো হইও। আঁই খবর লইর। পরর কথা হুনি কষ্ট নো পাইও।'

বললাম বটে, কিন্তু আমি তো জানি আসল ঘটনাটা কী! আমি আশ্চর্য হচ্ছি— সুপর্ণাদের পরিবারের কথা ভেবে! মেয়ে বিয়ে দেওয়ার আগে হীরামোহন, তার পরিবার পরিজন, তার বংশপরিচয়—এসবের কোনোটারই খবর নিলেন না তারা! সুপর্ণা কী এতই অরক্ষণীয়া হয়ে পড়েছিল! নাকি উপর্যুক্ত ছেলে পেয়ে তার বাপ-মা-বংশের খোঁজখবর নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে নি!

দিন দুয়েক পরে এক বিষণ্ন ক্লান্ত মেঘধরা বিকেলে আমি জেঠাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। জেঠাজেঠি উদ্‌গ্রীব হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। আমি মাথা নিচু করে নিম্নস্বরে বলেছিলাম, 'ঘটনা ঠিক, হীরামোহন হিঁদুর মাইয়া বিয়া গইয্যে।'

'অ ভগমানরে—' বলে জেঠি মেঝেতে পড়ে গেল। কিন্তু ওই সময় আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে জেঠা বলে উঠল, 'তুঁই এই রইম্যা ভাণ্ডি কা পইত্যা লাইগ্যা? আঁরার পোয়া উচ্চবংশর মাইয়া বিয়া গইয্যে। আঁরার জাতত্ লেয়াপড়া জানইন্যা মাইয়া কডে? আর হীরামোহন আঁর জনমর পোয়া। বেইমানি গইত্য নো আঁরার লগে।' বলে খুব চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেঠা।

জেঠাদের না জানিয়ে বিয়ে করা বেইমানি নয়, বিয়ের আসরে জীবিত মা-বাবার আশীর্বাদ পাওয়ার ব্যাপারটিকে আমল না দেওয়াটাও হীরামোহনের কাছে বেইমানি নয়! হীরামোহন জলদাস হীরামোহন চৌধুরী সেজে দত্ত পরিবারের জামাই হয়েছে, সেটা বললে জেঠার অবস্থাও হয়তো জেঠির মতো হবে এই মুহূর্তে; এইজন্যে হীরামোহনের ময়ূরপুচ্ছ ধারণের বিষয়টি আমি আমার কণ্ঠের ভেতরে চেপে রাখলাম। সেই সন্ধেয় আমার মাথা মাটির সমানে নামিয়ে আমি বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। জেঠার হু হু কান্নার আওয়াজেও পেছন ফিরে তাকাই নি।

শুনেছি, মাস কয়েক পরে জেঠা একটু আত্মস্থ হয়ে হীরামোহনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। হীরামোহন তত দিনে জাহাজে উঠে গেছে। হেমসেন লেইনে একটা বড় বাসায় বউকে রেখে গেছে সে। সুপর্ণাও কৃষি ব্যাংকে চাকরি পেয়ে গেছে একটা। সুখমোহনকে সঙ্গে নিয়ে এক সন্ধেয় সুবল জেঠা হীরামোহনের বাসায় উপস্থিত হয়েছিল।

দরজা খুলে সুপর্ণা কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছে, 'কী চাই?'

সুখমোহন কিছু বলবার আগেই জেঠা বলে উঠল, 'হীরামোহন কই, আঁর পোয়া হীরামোহন?'

জেঠার বেশভূষা, জীর্ণ চেহারার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে সুপর্ণা বলল, 'কী বলছেন আপনি! হীরা আপনার ছেলে! ওর তো কোনো বাপ-মা নেই! বাটপারি করতে এসেছেন?' তারপর কড়াচোখে তাকিয়ে ধমকের সুরে সুখমোহনকে বলল,

BanglaBook.org

'তুমি কে ? তুমি কে ছেলে ? বাটপারের সঙ্গে টাউট জুটেছ ?' ধড়াম করে কপাট লাগানোর আগে বলল, 'হীরা ঘরে নেই। জাহাজে গেছে।'

এই সময় সুখমোহন বলে উঠল, 'দেমাক দেখাচ্ছেন ? জাইল্যার পোলাকে বিয়ে করে মাটিতে পা পড়ছে না, না ?' বলেই পেছন ফিরল সুখমোহন। তার পেছনে জেঠা।

পেছন থেকে সুপর্ণার ভেঙেপড়া কণ্ঠ ভেসে এল, 'কী—!'

এরপর এক বছর দু' বছর করে অনেকটা বছর কেটে গেল। হীরামোহন আর কখনো মহেশখালীতে এল না। দু'-একবার বাহক মারফত মা-বাবার কাছে কিছু টাকা পাঠিয়েছে। শত দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও জেঠাজেঠি সে টাকা ছুঁয়ে দেখে নি। সুখমোহন বুরুমচড়া হাইস্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নিয়েছে। সামান্য বেতন। নিজের খরচপাতি চুকিয়ে সামান্য টাকাই মা-বাবাকে পাঠাতে পারে সে। শুনেছি—হীরামোহনের একটা কন্যাসন্তান হয়েছে। সন্তানটির নাকি কোমর থেকে নিচের দিকে অবশ।

জেঠা ঝড়জলের রাতে, গ্রীষ্মের ঠাঠা রোদ্দুরে, সকালে, সন্ধেয় টাউঙ্গাজাল বাইতে যায়। মাথা নিচু করে বাজারের ভেতর দিয়ে জাল কাঁধে হেঁটে যায় সুবল জেঠা। কুঁজো হয়ে গেছে জেঠা। দাড়ি-গোঁফ-চুলে তার আসল চেহারা ঢাকা পড়ে গেছে। জেটির অবস্থা কী জানি না। দীর্ঘদিন জেঠাদের খোঁজখবর নিই নি।

একদিন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। সমস্ত আকাশজুড়ে মেঘের তোলপাড়। মেঘের গর্জনে আকাশ বুঝি খান খান হয়ে যাবে। বাজার করতে এসে আটকে গেছি। চা-দোকানে বসে আছি বৃষ্টি থামার আশায়। দেখলাম—একটা পলিথিনের ব্যাগ মাথায় জড়িয়ে সুবল জেঠা খালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কাঁধে জাল, পিঠে দুইজ্যা। দোকান থেকে খলিল মেম্বার চিৎকার করে উঠল, 'অ সুবইল্যা, পোয়া ইঞ্জিনিয়ার অইয়ে, তোর কোয়ালর দুঃখ আইজো নো ঘুচিল দে না!'

বৃষ্টির দাপটে খলিল মেম্বারের মন্তব্য জেঠার শুনতে পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু জেঠা শুনতে পেল। থমকে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরল। তারপর ডান হাতের তালু দিয়ে নিজের কপালে জোরে জোরে আঘাত করতে লাগল। ওই সময় জেঠার চোখ থেকে অশ্রু পড়ছিল কি না বুঝতে পারছিলাম না। বৃষ্টির জল তার চোখ-মুখ-দেহ ধুয়ে দিচ্ছিল তখন।

BanglaBook.org

ম্যাডাম

'পানি কি সব সময় পাওয়া যাবে আপা ?' বিনীত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন অধীরবাবু।

'আপা নয়, ম্যাডাম। ম্যাডাম শুনতে আমি অভ্যস্ত। এ বিল্ডিংয়ের সব ভাড়াটে আমাকে ম্যাডাম বলে ডাকে।' তারপর তৃপ্তির সামান্য ঢেঁকুর তুলে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে অধীরবাবুকে বললেন, 'পানি সব সময় পাওয়া যাবে কি না জিজ্ঞেস করছিলেন না আপনি ? সব সময় নয়, চব্বিশ ঘণ্টাই পানি পাবেন আপনি আমার বিল্ডিংয়ে।' বলে উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন আনোয়ারা বেগম। পাশের সোফায় বসা স্বামী আজিজুল হকের দিকে তাকিয়ে তিনি আবার বললেন, 'তুমি কী বল! মিথ্যে বলেছি ?'

'আর ভাড়া ম্যাডাম, মাসে ভাড়া কত দিতে হবে ?' অধীরবাবু আগের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন।

'ভাড়া ? ভাড়া খুব বেশি না। দুটো বেডরুম, ড্রইংরুম, ডাইনিংরুম মিলে রুমের সংখ্যা তো কম না! সে অনুপাতে ভাড়া অনেক কম। মাত্র তের হাজার। তবে আপনি শিক্ষকমানুষ, কতই বা বেতন পান! আপনি বারো হাজারই দেবেন।' আনোয়ারা বেগম বললেন।

অধীরবাবু আগের চেয়ে আরও কুঁজো হয়ে গেলেন। পাছার অর্ধেকাংশ সোফায় লাগিয়ে বসে ছিলেন তিনি, এখন আরও সামনে এসে কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বললেন, 'নিচতলা আপা সরি ম্যাডাম। ঘরগুলো স্যাঁতস্যাঁতে, অন্ধকার। দেখলাম একটা জানালার পাশে সার্ভেন্ট টয়লেট, খোলা। বাসার খুব প্রয়োজন আমার। আপনার বাসাটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তাই বলছিলাম কী ম্যাডাম, যদি আমার কাছ থেকে দশ হাজার নিতেন!'

'দশ হাজার!' চোখ কুঁচকে দ্রুত উচ্চারণ করলেন আনোয়ারা বেগম। 'আপনি বোধহয় ভুল জায়গায় এসেছেন মাস্টারবাবু। এর চেয়ে কমে বাসা পাবেন না আমার এখানে।' তারপর সোফা থেকে উঠতে উঠতে বললেন, 'দু' দিন ভেবে দেখেন। দু' দিন পর বলে যাবেন বাসা নেবেন কি নেবেন না। এর মধ্যে তের হাজারি ভাড়াটে এলে ওদের দিয়ে দেব।'

অধীরবাবু দ্রুত বলে উঠলেন, 'আমি বাসাটা নিলাম ম্যাডাম।'

'দু' মাসের অ্যাডভান্স দিতে হবে।' আনোয়ারা বেগম বললেন। 'ও হ্যাঁ, ছেলেমেয়ে তিনজন বলছিলেন না আপনি। আগামীকাল বিকেলে স্ত্রী আর বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে একবার আসবেন। ওদের দেখা দরকার আছে আমার।'

BanglaBook.org

পরদিন বিকেলের ইন্টারভিউতে পাস করেছিলেন অধীরবাবু এবং তাঁর পরিবারবর্গ। সেই থেকে অধীরবাবু 'আনোয়ারা ভবনে' বাস করছেন।

ঢাকার মতন চট্টগ্রামও এখন দুটো অংশে বিভক্ত—ওল্ড চিটাগাং আর নিউ চিটাগাং। শহরের উত্তর পশ্চিমে নিউ চিটাগাংয়ের বিস্তৃতি। কর্ণফুলীর পাড়ে পুরাতন চট্টগ্রাম। নদীপাড়েই সকল শহর। বেশিরভাগ শহরের পত্তন হয়েছে নদীপাড়ে। একসময় নদীপথই সকল যোগাযোগ আর ব্যবসাবাণিজ্যের প্রধান মাধ্যম ছিল। এ কারণে বুড়িগঙ্গা বা টেমস্, গঙ্গা বা কর্ণফুলী যে নদীই হোক না কেন শহর গড়ে উঠেছে তাদের পাড়ে। চট্টগ্রাম শহরও কর্ণফুলীর পাড়ে একসময় গড়ে উঠেছিল। ওল্ড চিটাগাং এখন এটি। সদরঘাট, মাঝিরঘাট, ফিসারিঘাট—এসব ঘাট দিয়ে আন্তর ও বহির্বাণিজ্য চলত। নদীর পাড়েই ফিরিঙ্গিবাজার, কোতোয়ালি, পাথরঘাটা, বংশাল এরিয়া। এসব এরিয়াতে ইংরেজদের বসবাস ছিল একসময়। এখানে নেটিভদের বসবাস তো দূরের কথা, যাতায়াতও নিষিদ্ধ ছিল একসময়। ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষ ত্যাগ করলে ফিরিঙ্গিবাজার এলাকা আর ফিরিঙ্গিদের রইল না। বনেদি হিন্দু-মুসলমানেরা এসব অঞ্চলে বসবাস শুরু করল। তারা নিজেদের রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী ঘরবাড়ি-বিল্ডিং করল। 'আনোয়ারা ভবন' এরকম একটা বিল্ডিং, যা বানিয়েছেন আজিজুল হক কিন্তু যার মালিক আনোয়ারা বেগম। তাঁরই নামানুসারে এই বিল্ডিংয়ের নাম 'আনোয়ারা ভবন'। 'আনোয়ারা ভবন' পাঁচতলা, প্রত্যেক তলাতে দুটি করে ইউনিট। আশপাশের বিল্ডিংয়ের চেয়ে এই বিল্ডিংয়ে ভাড়া বেশি, কারণ বিল্ডিংটির বাইরে অত্যন্ত সুসজ্জিত; প্রশস্ত টাইল্স করা সিঁড়ি এর। সিঁড়ির পাশের হাতল সেগুন কাঠের, দরজা সুচারু, কারুকার্যময়। আনোয়ারা বেগম তাঁর বিল্ডিংয়ের প্রশংসা সুযোগ পেলে করেন। বিল্ডিংয়ের প্রসঙ্গ তোলার সুযোগ না থাকলেও নানা উছিলায় সুযোগ করে নেন।

আনোয়ারা বেগমের স্বামী আজিজুল হক টিঅ্যান্ডটির ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন। চাকরি করতে করতেই জায়গা কিনেছেন, বিল্ডিং বানিয়েছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে আজিজুল হক এত টাকা পেলেন কোথায়? চাকরির বেতনের তো একটা লিমিটেশন আছে, একটা নির্ধারিত স্কেলে বেতন পান সরকারি কর্মকর্তারা। টিঅ্যান্ডটির মধ্যম মানের একজন ইঞ্জিনিয়ারের বেতনস্কেলই বা কত? তারপরও একটা ছেলেকে ডাক্তার, একটা ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার আর একটা মেয়েকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়িয়েছেন আজিজুল হক। তারপর বানিয়েছেন বাড়ি। বুদ্ধিমান তিনি। অবৈধ আয়ের জায়গা ও বাড়িটি নিজের নামে করেন নি, বউয়ের নামে রেজিস্ট্রি করিয়েছেন। বিল্ডিংয়ের গায়ে 'আনোয়ারা ভবন' নামটি খোদাই করিয়েছেন পরম যত্নে। শ্বেতপাথরে খোদাই করা নামফলকের সামনে পথচারীরা একমুহূর্তের জন্য হলেও দাঁড়ায়, সৌন্দর্য উপভোগ করে। মূল গেইটের দু'পাশে দুটো গাছ—রাধাচূড়া আর কৃষ্ণচূড়া। রাধাচূড়া হলুদ আর কৃষ্ণচূড়া লাল। এপ্রিল-মে-তে

BanglaBook.org

যখন ফুল ফোটে, তখন তা দেখার মতো একটা বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এ এলাকায়। হলুদ-লালের এক অসাধারণ রংবাহারের সৃষ্টি হয় 'আনোয়ারা ভবনে'র সামনে। শত শত ভোমরা দিনরাত মধু সংগ্রহ করে ফুল থেকে। আর এলাকার বিরহীদের মনে হাহাকারের ঝড় উঠে ফুলের অসহনীয় সৌন্দর্যে। বাইরের মানুষেরা মনে করে—আহা! যারা এই ভবনে বাস করে, তারা কী সৌভাগ্যবান!

কিন্তু ভেতরের চিত্র অন্য।

অধীরবাবু যে বছর এলেন এই বিল্ডিংয়ে, আনোয়ারা বেগমের ছোট মেয়েটি ক্লাস সেভেনে। মেয়েটি অঙ্কে কাঁচা। অধীরবাবু বিএসসি, গণিতের শিক্ষক। প্রাইভেট পড়ান। অনুরোধ করে অধীরবাবু ঘরে প্রাইভেট পড়ানোর অনুমতি আদায় করেছেন আনোয়ারা বেগমের কাছ থেকে। সেদিন বিকেলে অধীরবাবুর দরজায় টোকা দিলেন আনোয়ারা বেগম। দরজা খুলে অধীরবাবু ভয় পেয়ে গেলেন, সামনে আনোয়ারা ম্যাডাম দাঁড়িয়ে। নির্মোহ চোখ, গাম্ভীর্য থিকথিক করছে সমস্ত চেহারায়। ছুট করে দরজার সামনের মেঝেতে তাকালেন অধীরবাবু। সেখানে কোনো জুতোজাতা আছে কি না অধীরবাবুর অধীর চোখ খুঁজে ফিরতে লাগল। সেখানে পড়ুয়াদের কোনো জুতা-স্যান্ডেল দেখতে না পেয়ে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন অধীরবাবু। সেদিন কী কাণ্ডটাই না ঘটে গিয়েছিল পড়ুয়াদের জুতা-স্যান্ডেল নিয়ে! নিচতলার একটি ফ্ল্যাটে থাকেন অধীরবাবু। মুখোমুখি ফ্ল্যাটে থাকেন আনোয়ারা বেগম, সপরিবারে। অবশ্য ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাট তাঁর। নিচতলার ভেতর থেকে দোতলায় উঠার সিঁড়ি। নিচতলায় ডাইনিং রুম, ড্রইং রুম এবং সার্ভেন্টস রুম, ওপরতলায় লিভিং রুম। সকালের ব্যাচে অনেক ছাত্রছাত্রী। দরজার সামনের লবিটা জুড়ে নানা কিসিমের জুতা-স্যান্ডেল। ছোট, বড়, মাঝারি—নানা আকারের পাদুকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ওই দিনও দরজায় খটাস খটাস খট আওয়াজে দরজা খুলেছিলেন অধীরবাবু। আনোয়ারা বেগম চিৎকার করে উঠেছিলেন, 'আমি কি জুতার দোকান দেওয়ার জন্য আপনাকে ফ্ল্যাটটি ভাড়া দিয়েছি ?'

আমতা আমতা করে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন অধীরবাবু। চোখ বাঁকিয়ে তর্জনী উঁচিয়ে আনোয়ারা বেগম বলেছিলেন 'কোনো কথা বলবেন না অধীরবাবু। আমি আপনাকে ভাড়া দিয়েছি থাকবার জন্য, ছাত্রছাত্রীদের গোশালা বানাবার জন্য নয়।' ছাত্রছাত্রীদের যে গোশালা হয় না, শুধু গরুরই গোশালা হয়, সেটা হয়তো আনোয়ারা বেগমের জানা নেই অথবা ওইসময় তাঁর মাথায় আসে নি। কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে অধীরবাবুকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আনোয়ারা বেগম গলা উঁচিয়ে বললেন, 'শুনেন, জুতার প্রদর্শনী এখানে চলবে না। হাত-পা ধরে কাকুতি-মিনতি করেছেন, পড়ানোর অনুমতি দিয়েছি। যা করবেন ঘরের ভিতরে। ভবিষ্যতে দরজার বাইরে একটা তেনা পর্যন্ত যেন না থাকে। মনে থাকে যেন, নইলে পথ দেখতে হবে আপনাকে।' বলেই পেছনে ফিরেছিলেন আনোয়ারা বেগম।

আদাব-নমস্কার দিতে ভুলে গেলেন অধীরবাবু। আনমনে কী যেন ভাবছেন তিনি তখন। নিজের ভেতরে চোখ রেখে আতিপাতি করে অধীরবাবু তখন খুঁজে বেড়াচ্ছেন—কখন আনোয়ারা বেগমের হাতে এবং পায়ে ধরে প্রাইভেট পড়ানোর অনুমতি আদায় করেছেন। হ্যাঁ, অনুমতি নিয়েছিলেন তিনি, তবে হাতে পায়ে ধরে নয়, মুখে অনুরোধ করে।

'ম্যাডাম, আসেন আসেন ভিতরে আসেন।' মুখে যতই গদগদ ভাব দেখান না কেন গলায় অস্বস্তির কাঁটা বিঁধে আছে অধীরবাবুর।

'না, আমি ভেতরে যাব না।' দাপুটে কণ্ঠ আনোয়ারা বেগমের।

অস্থির গলায় অধীরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু কি বলতে এসেছিলেন ম্যাডাম ?'

আনোয়ারা ম্যাডাম বললেন, 'হ্যাঁ, আমার মেয়ে ক্লাস সেভেনে পড়ে। অঙ্কটা সে গুছিয়ে উঠতে পারছে না। আপনি তো গণিতের মাস্টার। মেয়েটাকে একটু দেখেন। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে তো, একটু যত্ন নিয়ে দেখতে হবে।' শেষের কথাগুলো শুধুমাত্র অহংকার প্রকাশ করার জন্য বললেন।

অধীরবাবু আগবাড়িয়ে বললেন, 'কোনো চিন্তা করবেন না ম্যাডাম। কাল থেকে পাঠিয়ে দেন, একা দেখব তাকে, যত্ন করে দেখব।'

'ঠিক আছে।' বললেন ম্যাডাম আনোয়ারা।

পরবর্তী আট মাস অনেক যত্ন নিয়ে ম্যাডামের মেয়েটিকে দেখলেন অধীরবাবু। মেয়ে স্বচ্ছন্দে গণিতের বৈতরণী পার হয়ে গেল। মেয়েকে পড়ানোর জন্য ম্যাডাম অধীরবাবুকে কোনো টিউশন ফি দিলেন না। মনে করলেন—আমারই বিল্ডিংয়ে আশ্রয় দিয়েছি, তাতেই তো মাস্টারের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। টিউশন ফি আবার কিসের!

সিঁড়ির নিচে সারি সারি মিটার। একদিন দেখা গেল—বিদ্যুৎ অফিসের দুজন লোক গভীর মনোযোগ দিয়ে মিটারগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। এগারোটি মিটারের মধ্যে একটি পানি তোলার মিটার। গভীর প্রশস্ত পানির একটি হাউস আছে। ডিপ টিউবওয়েল থেকে পাম্পের মাধ্যমে পানি টেনে হাউস ভর্তি করা হয়। ওই পানি তোলার মিটারে তখন রিডিং ওঠে। দেখা গেল পানি তোলার মিটারে চোরালাইনের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ধরা পড়ে গেলেন ম্যাডাম। কিন্তু তিনি মচকালেন না। জামাই আদরে ওই দুজনকে ড্রইংরুমে বসালেন। নিচু স্বরে তাদের সঙ্গে কী সব ভুজংভাজং করলেন। কিছুক্ষণ পর তৃপ্তমুখে বেরিয়ে গেল বিদ্যুৎ অফিসের দুজন।

এরপর থেকে আনোয়ারা ম্যাডাম ক্ষেপে গেলেন। এলান জারি করলেন—মিটার বদলাতে হবে, প্রত্যেক ভাড়াটেকে এক হাজার করে দিতে হবে। তেতলার হাফিজ সাহেব বললেন, 'আপনার তো সব ডিজিটাল মিটার। বদলানোর দরকার কী ? আর

BanglaBook.org

যদি বদলাতে হয়—মিটারের দাম দেবেন আপনি, আমরা নই।' ক্ষোভকে নিজের ভেতরে চেপে রেখে দিয়ে তিনি আরও বললেন, 'যাওয়ার সময় তো মিটারগুলো আর খুলে নিয়ে যাব না!'

ম্যাডাম বললেন, 'আপনাকে টাকাও দিতে হবে না, মিটারও খুলে নিয়ে যেতে হবে না। আপনি আমার বাড়ি ছাড়বেন, পনেরো দিনের মধ্যে!'

হাফিজ সাহেব স্কুলপড়ুয়া দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে মাসের শেষে বাসা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

একদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে অধীরবাবু দেখলেন গেইটের পাশে দাঁড়ানো কৃষ্ণচূড়া ও রাধাচূড়ার ডালগুলো কাটা হচ্ছে। ডালে ডালে তখন থোকা থোকা ফুল, লাল ও হলুদ আলো ছড়াচ্ছে। অবাক কণ্ঠে কাঠুরেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে ভাই, ডালগুলো কেটে ফেলছেন কেন?'

'শুধু ডাল নয়, গোড়াও কাটা অইব। মালিকানের হুকুম।' একটা ডালে দাওয়ের কোপ দিতে দিতে বলল কাঠুরে। অধীরবাবু নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। ম্যাডামের দরজায় গিয়ে জোরে জোরে নক করলেন। অনেকক্ষণ পরে ঘুমোচোখে আনোয়ারা বেগম দরজা খুললেন। সামনে অধীরবাবুকে দেখে রাগী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বাবু? এরকম করে নক করছেন কেন দরজায়, যেন ডাকাত পড়েছে। আপনি জানেন না এখন ঘুমের সময়? যা বলার সন্ধেয় বলতে পারতেন।'

ম্যাডামের কথা কানে না তুলে উদ্‌বিগ্ন গলায় অধীরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'ম্যাডাম, ফুলগাছগুলো কেটে ফেললেন যে! এত সুন্দর ফুলগাছ!'

এবার চোখ বড় বড় করে বিস্মিত কণ্ঠে আনোয়ারা বেগম বললেন, 'কী আশ্চর্য! আমার গাছ আমি কেন কাটছি, তার কৈফিয়ত দিতে হবে আপনাকে! আপনার তো সাহস কম না! বাড়ি বয়ে এসে কৈফিয়ত চাইছেন! যান, বাসায় যান। হাত মুখ ধোন, রেস্ট নেন।'

কাঁচুমাচু মুখে ফিরে আসবার সময় পেছন থেকে আনোয়ারা বেগমের কণ্ঠ শুনলেন, 'গাছগুলোর শেকড় আমার বিল্ডিং ফাটিয়ে ফেলছে, না কেটে গাছের গোড়ায় সিন্দুর মাখব নাকি?'

পাশের বিল্ডিংয়ে চুরির অজুহাত দেখিয়ে গেইটে তালা লাগালেন ম্যাডাম। সব ভাড়াটেকে জানালেন—সব পরিবারে চাবি থাকবে। যেতে আসতে তালা খুলে বেঁধে যাবেন।'

পঞ্চমতলার সঞ্জয়ের মা বললেন, 'ম্যাডাম কোনো অতিথি এলে...?'

'তখন চাবি নিয়ে নামবেন।' যেন নির্দেশ দিলেন আনোয়ারা বেগম।

'এই বয়সে পঞ্চমতলা থেকে ওঠানামা করা কী কষ্টের হবে ভেবে দেখেছেন?' ভদ্রমহিলা বললেন।

BanglaBook.org

'ভালো বাড়িতে থাকবেন, নিরাপত্তা চাইবেন, আর সামান্য কষ্ট করবেন না।'

সঞ্জয়ের মা শেষ যুক্তি দিলেন, 'আমাদের বিল্ডিংয়ে তো চুরি হয়নি। চুরি হওয়ার আগে আমাদের এত কষ্টে ফেলবেন না ম্যাডাম।'

'যা বলেছি করেন। দল পাকাবেন না। হাফিজ সাহেবের কথা ভুলে যাওয়ার কথা নয় আপনার।'

নিকটে দুটো নামকরা স্কুল। ওই স্কুলে সঞ্জয়, কালাম, লাভলি, পম্পিরা লেখাপড়া করে। এ এলাকায় বাসা পাওয়া মুশকিল। তাই ভাড়াটেরা শত অপমান গঞ্জনার মধ্যেও বাসা ছেড়ে যান না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আনোয়ারা বেগম যা বলেন, তা মেনে চলেন।

ওই দিন আনোয়ারা বেগম আরও বলেছিলেন, 'চাবি আমি বানিয়ে দেব। প্রতিটি ছাব্বিশ টাকা করে। যে পরিবারের যতটা দরকার নিয়ে যাবেন।'

পরদিন চাবিওয়ালাকে গেইটের পাশে বসে চাবি বানাতে দেখা গেল। আনোয়ারা বেগম সামনে দাঁড়িয়ে। কন্যার ডাকে তিনি ভেতরে গেলে অধীরবাবুর স্ত্রী চাবিওয়ালাকে প্রতি চাবির মজুরি কত জিজ্ঞেস করলেন। চাবিওয়ালা বলল, 'দশ টাকা।'

এক সন্ধেয় ম্যাডামের কাজের মেয়েটি প্রত্যেক বাসায় একটি স্লিপ পৌঁছে দিল। তাতে লেখা—সিঁড়ি সর্বদা অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অংশ। কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সিঁড়ি পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব নেওয়া হলো। এজন্য প্রতি মাসে প্রত্যেক ভাড়াটেকে পঞ্চাশ টাকা করে দিতে হবে। ঘরভাড়ার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে চলবে। শেষে বিশেষ দ্রষ্টব্য দিয়ে লেখা—আপনারা অযথা পানি অপচয় করছেন। এভাবে চললে পানি সরবরাহ সার্বক্ষণিক থেকে দু'বেলায় নামিয়ে আনা হবে।

স্লিপটি পড়ে অধীরবাবুর স্ত্রী স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমাদের ম্যাডাম এবার সিঁড়িভাড়া নেওয়া শুরু করলেন। তবে ভাড়া বেশি না, মাত্র পঞ্চাশ টাকা।'

অধীরবাবু ম্লান মুখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

অধীরবাবুর স্ত্রী আবার বললেন, 'দেখো, পাকঘরের জানালার গ্রিলগুলো ক্ষয়ে গেছে। পাল্লাগুলো খোলা যায় না। ঘরের ভেতরের তেলধোঁয়া ঘরেই ঘুরপাক খায়। কাশি কাশি ভাব হয়ে গেছে আমার। দম নিতে ইদানীং খুব কষ্ট হচ্ছে। তুমি একটু ম্যাডামকে বলো না জানালাটা বদলে দিতে।'

অধীরবাবু অনেকটা স্বগত কণ্ঠে বললেন, 'দেখি।'

স্ত্রী বললেন, 'দেখি বলে এড়িয়ে যেয়ো না। সত্যি আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।'

এবার ম্লান চোখে অধীরবাবু স্ত্রীর দিকে তাকালেন। বললেন, 'তুমি তো জান আমাদের বেডরুমটির পাশেই বাড়িওয়ালির সার্ভেন্ট টয়লেট। জানালা খুললেই পেটফাটা বদবু। এর মধ্যে কতবার অনুরোধ করেছি ম্যাডামকে—টয়লেটটা সেনিটারি করে শক্ত মতন একটা দরজা লাগাতে। কিন্তু আমার বারবারের আবেদন

BanglaBook.org

উনি কানেই তোলেন নি।' তারপর একটা লম্বা শ্বাস ফেলে আবার বললেন, 'জানালা পাল্টানোর অনুরোধকে তিনি কি কোনো পাত্তা দেবেন!'

স্ত্রী বললেন, 'আচ্ছা, আমরা এখান থেকে চলে গেলে কেমন হয়। চলো না আমরা অন্য কোনো বাসায় চলে যাই।'

অধীরবাবু বললেন, 'তোমাকে না জানিয়ে বাসা কি কম খুঁজেছি আমি। গাছকাটা নিয়ে ম্যাডাম যেদিন আমাকে অপমান করলেন, সেদিন থেকেই বাসা খুঁজতে শুরু করেছি আমি। কিন্তু মনমতো এবং সামর্থ্যমাফিক বাসা পাওয়া দুষ্কর এ অঞ্চলে। দু'-দুটো নামকরা স্কুল। নিজ সন্তানদের সবাই এই স্কুলগুলোতে পড়াতে চায়। আমাদেরও তো দুটো বাচ্চা স্কুলে পড়ছে। সকালের স্কুল। ফিরিঙ্গিবাজার এলাকা থেকে দূরে চলে গেলে যাতায়াতের কষ্ট বাড়বে, খরচ বাড়বে। এইসব বিবেচনা করে বাসা খোঁজা একসময় থামিয়ে দিয়েছি। ম্যাডামের শত অত্যাচারেও চোখ বুজে আছি।'

স্বামীর কথা শুনে স্ত্রী আর কিছু বললেন না। কাজের বাহানায় অন্য কক্ষে চলে গেলেন।

পরের মাসে ম্যাডাম পানি সরবরাহ সত্যি সত্যি দু' বেলায় নিয়ে এলেন। মিস্ত্রি ডেকে তিনি এমন সিস্টেম করলেন—পানি তাঁর ফ্ল্যাটে অবিরাম থাকবে, কিন্তু ভাড়াটেরা পাবে দু' বেলা মানে সকালে এবং সন্ধেয়।

সঞ্জয়ের মায়ের জিজ্ঞাসার উত্তরে আনোয়ারা ম্যাডাম বললেন, 'এইভাবেই পানি দেওয়া হবে। পানি তোলার মেশিনেরও তো বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। আপনারা যেভাবে পানির অপচয় করছেন, তাতে পানির পাম্পকে চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি দিতে হবে।'

বড় বড় বালতি, ড্রাম কেনার ধুম পড়ে গেল ভাড়াটেদের মধ্যে। ফ্ল্যাটের সকল পাইপ ছেড়ে দিয়ে সবাই হুড়াহুড়ি করে ওইসব ড্রাম-বালতিতে পানি ধরতে লাগলেন। পনেরো-বিশ মিনিটের অধিক সময় পানি দেন না ম্যাডাম। ফলে প্রত্যেক ফ্ল্যাটে পানির জন্য হাহাকার পড়ে গেল। কয়টায় পানি দেবেন তারও কোনো ঠিকঠিকানা নেই। কখনো সাতটায় কখনো নয়টায় পানি দেন তিনি। নারীদের বাইরে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। চাকরিজীবী মহিলারা পড়লেন বড় বিপাকে। নির্দিষ্ট সময়ে পানি সরবরাহের অনুরোধ করলে ম্যাডাম তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন, 'আপনাদের কথামতো আমাকে পানি ছাড়তে হবে নাকি! আমার সময়ে আমি পানি ছাড়ব। ধরে রাখবেন।' বলে দড়াম করে নাকের ডগায় দরজা বন্ধ করে দিলেন ম্যাডাম।

এইভাবে চলতে লাগল দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। প্রতিদিন বাসি পানি দিয়ে গোসল করতে হয়। খাওয়ার পর জগে করে পানি নিয়ে মুখ ধুতে হয়। সকল ইংলিশ টয়লেট অকেজো হয়ে গেল। মলত্যাগ করার পরে টয়লেটের জলেই ওগুলো ভাসতে লাগল। ছোট বালতিতে করে টয়লেটে জোরে পানি নিক্ষেপ করতে হলো। ওই জল টয়লেটে প্রত্যাঘাত পেয়ে মলসহ নিক্ষেপকারীর গায়ে এসে পড়তে লাগল।

BanglaBook.org

বাসিন্দারা আগে যেখানে শাওয়ারের পানিতে গোসল করতেন, এখন বালতিতে সংরক্ষিত পানি থেকে দু'-চার মগ মাথা-গায়ে ঢেলে স্নানপর্ব সারতে লাগলেন। পানির অভাবে পোশাক-পরিধেয় দিন দিন ধূসর হতে লাগল।

একটা সময়ে ফ্ল্যাটের নারীরা একত্রিত হয়ে ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করলেন। আগের মতো সার্বক্ষণিক পানি সরবরাহের আর্জি জানালেন তাঁরা।

ম্যাডাম সোফায় হেলান দিয়ে আধাবোজা চোখে বললেন, 'যা নিয়ম করেছি, তা বলবৎ থাকবে। আগে যেমন চলেছেন, এখনো তো চলছেন।'

'আমাদের বড় কষ্ট ম্যাডাম।' সঞ্জয়ের মা বললেন।

'আমারও তো কষ্ট। মাসে মাসে গুচ্ছ গুচ্ছ টাকার বিদ্যুৎবিল দিতে হচ্ছে আমাকে। এত টাকা দিতে আমার কষ্ট হচ্ছে না—?'

মিসেস শাহেদা বললেন, 'আচ্ছা ম্যাডাম, এরকম করলে হয় না, আমরা যদি মাসে মাসে পানির বিলের জন্য কিছু টাকা দিই আপনাকে, তাহলে আপনারও কষ্ট হলো না, আমরাও আগের মতন পানি পেলাম।'

চট করে সোজা হয়ে বসলেন ম্যাডাম। বিস্ফারিত চোখ। তাতানো কণ্ঠে বললেন, 'কী বললেন আপনি ? নাউজুবিল্লাহ্ নাউজুবিল্লাহ্! মুসলমান হয়ে পানির টাকা নিতে বলছেন আমাকে ? এটা আমাদের প্রথাবিরুদ্ধ, বিশ্বাসবিরুদ্ধ জানেন না আপনি ?'

মিসেস শাহেদা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'সরি ম্যাডাম, আমি ওভাবে বলি নি। আমি বলতে চাইছি—পানি তুলতে তো পাম্প চলে, বিদ্যুৎ খরচ হয়, মিটার ঘোরে। বেশি টাকার বিল আসে। আমরা যদি প্রত্যেক পরিবার মাসে তিন শ' টাকা করে দিই, তাহলে আপনার কষ্টটা কমবে।' কথাগুলো বলে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে সোফায় হেলান দিলেন মিসেস শাহেদা।

শেষের বাক্যে কোনো শ্লেষ আছে কি না ক্যামেরার চোখে ম্যাডাম মিসেস শাহেদার চোখ-মুখ পরখ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর অলসভঙ্গিতে হাই তুললেন। বললেন, 'মন্দ বলেন নি। আপনি তো পানির বিলের টাকার কথা বলেননি, বলেছেন পানি তোলার বিদ্যুৎ খরচের কথা। আপনার প্রস্তাবটা মন্দ না।' তারপর আড়মোড়া ভেঙে বললেন, 'তো ওই কথাই রইল। মাসে মাসে পানি তোলার বিদ্যুৎ খরচ বাবদ আপনারা তিন শ' টাকা করে দেবেন। আমিও চেষ্টা করব পানি আগের মতো সার্বক্ষণিক দিতে।'

হঠাৎ অধীরবাবুর স্ত্রী বলে উঠলেন, 'ম্যাডাম, আমার একটা অনুরোধ ছিল।'

ম্যাডাম কিছু না বলে তাঁর দিকে তাকালেন।

অধীরবাবুর স্ত্রী বললেন, 'আমাদের রান্নাঘরের জানালাটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। খোলা যায় না। ধোঁয়ার দম বন্ধ হয়ে আসে আমার। আপনি যদি জানালাটা ঠিক করে দেন ম্যাডাম।'

BanglaBook.org

'ওই ঘরে রাঁধছেন আপনি, ফ্ল্যাটে বসবাস করছেন আপনারা। কোনো কিছু নষ্ট হলে ঠিক করবারও দায়িত্ব আপনাদের।' অধীরবাবুর স্ত্রীর চোখে চোখ রেখে যেন সবার উদ্দেশ্যে ম্যাডাম কথাগুলো বললেন।

মিইয়ে যাওয়া গলায় অধীরবাবুর স্ত্রী বললেন, 'দশ বারো হাজার টাকা লাগবে একটা ভাঙাচোরা জানালা বদলাতে। আপনি না পারেন, আমরা করে নিচ্ছি। ভাড়া থেকে টাকাটা কেটে রাখব আমরা।'

আকাশ থেকে পড়লেন ম্যাডাম। বিস্মিত গলায় বললেন, 'ভাড়া থেকে কাটবেন! ভাড়া থেকে কাটবেন মানে কী! থাকবেন আপনারা, জানালা বদলে দেব আমি! কোথায় পেয়েছেন এসব কথা!' তারপর বিচারকের কণ্ঠে বললেন, 'দেখুন, নিজেরা বদলে টদলে থাকতে পারলে থাকুন। না পারলে কী করতে হবে তা তো আপনার না জানার কথা নয়।'

এভাবেই সে সন্ধেয় কথা শেষ করেছিলেন ম্যাডাম আনোয়ারা বেগম।

দিন, সপ্তাহ, মাস গড়িয়ে বছর গেল। ম্যাডাম পানি দেন। তবে লোডশেডিং, পাম্প মেশিন নষ্ট হয়ে গেছে—এসবের দোহাই দিয়ে সরবরাহে বিঘ্ন ঘটান তিনি। ভাড়াটেরা চোখ বন্ধ করে ম্যাডামের অত্যাচার সহ্য করে যান।

শুক্রবারের এক দুপুরে রান্নাঘরেই বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন অধীরবাবুর স্ত্রী। চুলায় তখন বেগুনভাজি। ধোঁয়ায় সয়লাব গোটা ঘর। বেগুনভাজির পোড়া গন্ধে দম আটকে আসছে। বেগুনপোড়া গন্ধ গোটা রান্নাঘরে কুণ্ডুলি পাকিয়ে উঠছে। ধপাস করে পড়ার শব্দ শুনে অধীরবাবু দৌড়ে রান্নাঘরে গেলেন। পাঁজাকোলা করে স্ত্রীকে ড্রইংরুমে এনে ফ্লোরে শুইয়ে দিলেন। অ্যাম্বুল্যান্স ডাকা হলো। মুখে অক্সিজেনের মাক্স লাগিয়ে তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। কয়েক দিন থাকলেন তিনি হাসপাতালে। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে ডাক্তাররা বললেন—হাঁপানির লক্ষণ। ধোঁয়া, ধূলিকণা—এগুলো থেকে দূরে থাকবেন।

ডাক্তাররা বেডের পাশ থেকে সরে গেলে অধীরবাবুর স্ত্রী আকুতিভরা কণ্ঠে বললেন, 'আমাকে তুমি ম্যাডামের বাড়ি থেকে বের করার ব্যবস্থা কর। নইলে আমি বাঁচব না।'

অধীরবাবু স্ত্রীর ডানহাতটা ছুঁয়ে বললেন, 'শিগ্‌গির আমরা ম্যাডামের বাসা ছেড়ে দেব। আমরা এমন এক বাসায় যাব যেখানে ম্যাডাম নেই, মানবতা আছে।'

BanglaBook.org

অধরা

দাদা,

সম্পর্কে তুমি আমার বড় ভাই নও, পিতামহ। তারপরও তোমাকে আমি দাদা বলে ডাকতাম। খুব ছোটবেলা থেকে দাদা ডাকতেই শিখিয়েছিলে তুমি। মানুষ কতভাবেই না তার পিতামহকে সম্বোধন করে—দাদু, দাদুভাই, দাদুমণি এসব। এ সবের কোনোটাই পছন্দের ছিল না তোমার। দু' বছরের মাথায় যখন আমার মুখ দিয়ে একটু একটু বোল ফুটতে শুরু করল, পাশে বসিয়ে তুমি নাকি বলতে, 'দাদা, বলো দাদা—। বলো তুমি কেমন আছ?'

আমি তো তখন কিছুই বুঝতাম না। মন ভালো থাকলে আমি নাকি বলতাম, 'দা—দা। তুমি কে—।'

মাঝে মাঝে আমি নাকি কিছুই বলতাম না। তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চাইতাম। তখন তুমি ঝাপটে ধরতে আমাকে। জোর করে আমার মুখ থেকে দাদা ডাক শুনতে চাইতে। আমি খামছি মেরে হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে বিছানায় তোমাকে চিৎ করে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যেতাম মায়ের কাছে। পেছন থেকে তুমি নাকি ডেকে উঠতে, 'দাদা, দাদা, শুনে যাও, শুনে—।'

তোমার ডাক শুনে নাকি আমি আরও জোরে দৌড়াতাম। এসব কথাবার্তা আমার ঠাকুমার মুখ থেকে শোনা।

আরও পরে আমি যখন বড় হলাম। একদিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তখন আমি বাংলা অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে পড়ি। অলক চক্রবর্তী স্যার আমাদের গল্পগুচ্ছ পড়াতেন। অসাধারণ শিক্ষক ছিলেন তিনি। যেদিন 'পোস্টমাস্টার' পড়াতেন, সেদিন রতন হয়ে যেতাম আমি। 'হৈমন্তী'র বিষাদময় জীবনের কথা ভেবে কত রাত যে চোখের জলে বালিশ ভিজিয়েছি, তার হিসেব রাখি নি। 'শাস্তি'র চন্দরার জন্য আমার ভেতরটা চুরমার হয়ে যেত। একদিন স্যার বললেন, 'রবীন্দ্রগল্পে ভালোবাসার জন্যে হাহাকার আছে। কিন্তু আগাগোড়া ভালোবাসাময় কোনো গল্প রবীন্দ্রনাথ লেখেন নি।' বিষয়টি আমার মধ্যে একটা ঘোরের সৃষ্টি করল।

এই ঘোর নিয়েই বাড়িতে ফিরলাম আমি। বাড়িতে ফিরে দেখলাম—জানালার পাশে বসে উদাসীন চোখে বাইরে তাকিয়ে আছ তুমি। আমি একটু ভড়কে গেলাম। এরকম বিষণ্ন উদাসীন চেহারা কেন তোমার! মা কি কিছু বলেছে অথবা ভাই প্রশান্ত? তোমার কষ্ট আমার বুকে শক্তিশেল হয়ে বিঁধে। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়েছিলাম তোমার কাছে। আলতো করে তোমাকে ছুঁয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'দাদা, মা কিছু

BanglaBook.org

বলেছে ? এত বিষণ্ন চোখে কী দেখছ, বাইরে ?' দাদা, তুমি চোখ ফিরিয়েছিলে আমার দিকে। জলো চোখ তোমার। আমি আরও বেশি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। দু' হাত বাড়িয়ে তোমাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। এর মধ্যে তুমি নিজেকে সামলে নিয়েছ। তুমি ব্যাপারটি এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে বলছিলে, 'ছাড়ো ছাড়ো আমাকে। তোমার স্বামী যদি কোনোদিন জানতে পারে, তুমি আমাকে জড়িয়ে-টড়িয়ে ধরেছ, তাহলে কী হবে ভেবে দেখেছ!'

'ধুত্তুরি স্বামী! যার এখনো বিয়েই হয় নি, তার আবার স্বামীভয়। জানতে চাইলে বলব—দাদার সঙ্গে আমার গভীর প্রেম।' যেন আমার স্বামী বর্তমান, যেন তাকে কৈফিয়ত দিচ্ছি এই ভঙ্গিতে বলেছিলাম কথাগুলো।

দাদা, মুচকি হাসলে তুমি। আমি আবার বললাম, 'দাদা, হৈমন্তী যেমন করে অপুকে ভালোবাসত, রতন যেমন করে পোস্টমাস্টারকে পছন্দ করত, চন্দরা যেমন করে ছিদামকে ভালোবাসত, সেরকম করে আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি বাসো না আমাকে ?'

এই সময় খুব উঁচু গলায় হেসে উঠেছিলে তুমি। আমার চোখে চোখ রেখে বলেছিলে, 'বাসি তো।'

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিলাম, 'মিথ্যে, সব মিথ্যে! তুমি আমাকে তেমন করে ভালোবাস না। যদি বাসতে, বলতে—তোমাকে আমি খুব ভালোবাসি। একজন ভালোবাসার মানুষ কখনো বাসি তো বলে না। ঠিক কি না বলো ?'

দাদা, ওই সময় তুমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলে। নিজেকে সামলে নিয়ে আমার নাকটা চেপে ধরে বলেছিলে, 'খুব পেকে গেছ, না ?'

দাদা আমি জানি তোমার ভেতরে গভীর একটা কষ্ট আছে। সেই কষ্টটা তোমাকে মাঝে মাঝে অস্থির করে তোলে। তোমার এ কষ্টটার নাম আমি অনুমান করতে পারি। না-পাওয়ার কষ্ট তোমার। কাকে পাওয়ার ছিল তোমার, কাকে পাও নি—এ নিয়ে কোনোদিন মুখ খোলো নি তুমি। খুলবে কী করে ? ঘরে ছিল যে আমার ঠাকুমা, ঘরে যে তোমার পুত্র, পুত্রবধূ আর নাতি-নাতনিরা।

তবে মেয়ে বলে, একটু আধটু বইপত্র পড়ি বলে, কৈশোর-উত্তীর্ণ হয়েছি বলে আমি বুঝতে পারি—তুমি একজনকে ভালোবাসতে। ঘরে আনতে পারো নি তাকে। ঘর করেছ অন্যজনকে নিয়ে।

আমি বলে উঠেছিলাম, 'পাকা টাকা বুঝি না। আজ বলতেই হবে তুমি এত বিষণ্ন থাকো কেন।'

'শোনো পাগলি, তোমার মা তো আমাকে ভীষণ ভালোবাসে। মেয়ে নেই আমার। আমার বুকে কন্যার জন্যে যে আলাদা জায়গাটা ছিল, তা ভরিয়ে তুলেছে তোমার মা। তোমার ঠাকুমা মারা যাওয়ার পর থেকে তোমার মা-ই তো আমার সকল কিছু দেখভাল করে। তোমার মা আমাকে কিছু বলতে যাবে কেন ?' বলে তুমি চুপ মেরে গিয়েছিলে।

BanglaBook.org

'তাহলে এই উদাসীন চোখ, এই বিষণ্ন চেহারা! এর কারণ কী ?' আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তোমাকে।

তুমি বলেছিলে, 'কলেজ থেকে এসেছ। হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও। আরেক সময় বলা যাবে।'

'বলবে তো, সত্যি বলছ তো ?' আদুরে গলায় বলেছিলাম আমি।

তুমি আমার দিকে চেয়ে বিষণ্ন হেসেছিলে।

আরেক দিন তোমাকে চেপে ধরেছিলাম আমি। ভীষণ বৃষ্টি ছিল সেই দুপুরে। বৃষ্টির তোড়ে চারদিক আঁধার আঁধার। আমাদের তেতলা বাড়ির দোতলার পশ্চিম দিকের ঘরে তুমি থাকতে। তোমার ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বিশাল বারান্দা। সেই বারান্দায় বসে ছিলে তুমি। বৃষ্টির কণা এসে পড়ছিল তোমার মুখে-হাতে-পায়ে। পাই পাই করে সঞ্চিত টাকায় তুমি বাড়িটা বানিয়েছিলে। আমার বাবা তখনো পড়াশোনা শেষ করে নি। বাবা নিজের পড়াশোনা ছাড়া অন্য কিছু বুঝত না। বৈষয়িক ব্যাপারে তার তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না। একাই নিজের পরিকল্পনায় ও শ্রমে বাড়িটি বানিয়েছিলে তুমি। বাড়িটার নাম দিয়েছিলে—'অধরা'। অধরা কোনো বাড়ির নাম হয় নাকি ? তারপরও তুমি তোমার বাড়ির নাম রেখেছিলে অধরা।

সেই বৃষ্টিময় দুপুরে তোমাকে চেপে ধরেছিলাম, 'বলো দাদা, এই বাড়িটার নাম অধরা রেখেছ কেন ?'

তুমি মৃদু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলে, 'এমনি এমনি।'

'তুমি আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছ দাদা! অধরা তোমার মায়ের নাম না, তোমার ঠাকুমার নামও নয়। আমার ঠাকুমার নাম তো শ্রীমতী। তাহলে কার নাম এটা ?' বললাম আমি।

'কারও নাম না।' দাদা তুমি বললে।

আমি চটজলদি বললাম, 'কারও নাম না, কিছুর নাম তো ?'

বাইরে বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। তুমি বারান্দা ছেড়ে ঘরে ঢুকলে। জানালা মুখে নিয়ে তুমি চেয়ারে বসলে, পাশে আমি। তোমার বিছানায় যোগাসনে বসেছিলাম আমি। বাবা অফিসে। মা রান্না-খাওয়ানোর পাট চুকিয়ে নিজের ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে। গত ক'দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছিল। সেদিন বৃষ্টির তোড় বেশি বলে আমি কলেজে যাই নি। ঠাকুমা মারা গেছে গেল বছর। একাকী জীবনযাপন তোমার দাদা। আমি সময় পেলে তোমার কাছে গিয়ে বসতাম।

সেদিন ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসার পর তোমাকে আর প্রশ্ন করতে হয় নি। তুমি নিজে থেকে বলা শুরু করলে। খুবই মৃদুস্বরে বললে, 'যাকে পাই নি, তার স্মৃতি মনে রেখেই বাড়িটির নাম রেখেছি অধরা।'

BanglaBook.org

আমি নরম কণ্ঠে বললাম, 'কাকে পাও নি তুমি দাদা ? কার জন্য তোমার এত কষ্ট ?'

দাদা, তুমি দীর্ঘক্ষণ মাথা নিচু করে বসেছিলে। আমিও চুপচাপ অপেক্ষা করছিলাম তোমার উত্তরের।

বারান্দা ঘেঁষেই একটা নারকেল গাছ। ফলবতী। দোতলা পর্যন্ত এসেই থেমে গিয়েছিল নারকেল গাছের মাথাটি। তার ডালগুলোর বেশ কয়েকটি বারান্দার ভেতরে আগা বাড়িয়েছিল। মাঝে মাঝে ওগুলোর ওপর হাত বুলাতে দেখেছি আমি তোমাকে। একদিন আমি ডালের আগাগুলো কেটে দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলাম তোমাকে। তুমি আঁতকে উঠেছিলে। বলেছিলে, 'না না। ওগুলো থাক। ওগুলো আমার নির্জনতার সঙ্গী।'

আমি বুঝতে পেরেছিলাম—ওগুলো তোমার কাছে নিছক নারকেল গাছের ডাল নয়, অন্য কিছু। হয়তো কারও প্রতীক, হয়তো কারও স্মৃতি। তা নইলে কেন গভীর বিভোরতায় তুমি ওই ডালগুলোর গায়ে হাত বুলাও!

দাদা, তোমার প্রিয় নারকেল গাছের গায়ে দাপিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। হঠাৎ দমকা হাওয়া লাগল ডালের গায়ে। বিকট আওয়াজ করে ডালগুলো গ্রিলে আছড়ে পড়ল। তোমার ধ্যান ভাঙল যেন তখন। তুমি মাথা তুললে। আমার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে বললে, 'সে ছিল প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা।'

আমি সচকিত হয়ে বললাম, 'তুমিও তো প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার ছিলে।'

'তখনো আমি হেডমাস্টার হই নি। ওর মতোই সাধারণ শিক্ষক ছিলাম আমি।'

'নিশ্চয় একই স্কুলে পড়াতে তোমরা!'

'হ্যাঁ, আমি আর যশোদা একই স্কুলে পড়াতাম। আগে থেকেই আমি হালিশহর সরকারি প্রাইমারি স্কুলে ছিলাম। আমার দু' বছর পর যশোদা ওই স্কুলে পোস্টিং পেয়েছিল।'

'তারপর ?' উদ্‌গ্রীব কণ্ঠ আমার।

'সে ছিল কালাকোলা। ক্ষীণকায়। লম্বাটে। শাড়ি পরলে তাকে খুব বেমানান লাগত। পায়ের গোড়ালিগুলো বিসদৃশ্যভাবে দেখা যেত। অন্য কলিগরা হাসাহাসি করত ওকে নিয়ে।'

'তুমি হাসতে না ? তুমি তো দেখতে সুপুরুষ, সুন্দর।' বলেছিলাম আমি।

'এখন নয়, যৌবনে ছিলাম সুপুরুষ আর সুন্দর।' একটু থেমে তুমি বলেছিলে, 'কেন জানি আমার হাসি পেত না। বরং মস্করাপ্রবণ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমা হতো আমার মধ্যে।'

'কেন ?'

BanglaBook.org

'এর কোনো সঠিক ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। অন্যরা যেখানে আড়ালে আবডালে যশোদাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করছে, সেখানে আমি কেন বিরত থাকতাম, তার সঠিক কারণ এখনো আমি খুঁজে বের করতে পারি নি। হতে পারে যশোদার নিরীহ ভাবের জন্যে, সহজ-সরল চেহারার জন্যে, মৃদু কণ্ঠে শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলার জন্যে। তার অত্যধিক লম্বা চুল থাকার কারণেও হতে পারে।'

'মানে তুমি তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলে! সত্যি বলছি না ?' দাদা তোমার হাত ঝাঁকিয়ে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

'প্রেম-ট্রেম তো তখনো বুঝি নি। হ্যাঁ, তাকে ভালো লাগতে শুরু করেছিল আমার।' শরমিন্দা চোখে বলেছিলে তুমি।

'ওই ভালোলাগা থেকেই তো ভালোবাসা জন্মে। ভালো লাগতে লাগতে কোনো এক হিরণ্ময় মুহূর্তে তুমি ওই মহিলাকে নিজের হৃদয়ে স্থান করে দিয়েছিলে। ঠিক কি না বলো!' উচ্ছ্বসিত গলায় বলেছিলাম আমি।

আমার কথার কোনো উত্তর দিলে না তুমি দাদা। আপনমনে বলে চললে, 'আমাদের মেলামেশা একটু গাঢ় হলো। ও থাকত আগ্রাবাদে, দিদির বাসায়। তার বোনজামাই কী একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করত। কিশোরগঞ্জে বাড়ি ছিল যশোদার। মা-বাবা দেশের বাড়িতে থাকত বলে বোনের বাসাতেই থাকতে হতো যশোদাকে।

যশোদা আসত আগ্রাবাদ থেকে, আমি যেতাম কাটগড় থেকে। ছুটির পর বাড়িতে ফেরার তেমন তাড়া ছিল না আমার। কিন্তু যশোদা তাড়াতাড়ি ফিরতে চাইত। কিন্তু মজার কাণ্ড কি জানো ?' বলেই দাদা চুপ মেরে গেলে তুমি।

'কী মজার কাণ্ড! মজার কাণ্ড কী! বলো না দাদা'—অবিরাম বলে যাচ্ছি আমি, আর মুখে ফিকফিকে হাসি নিয়ে তুমি আমার দিকে তাকিয়ে আছ। তোমার চোখে তখন দুষ্টুমির বন্যা।

একসময় তুমি বললে, 'আর না। আমার সবকিছু জেনে নিচ্ছ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে, একসময় মা-বাবার সামনে আমাকে বিপদে ফেলবে।'

'না, না দাদা, বিপদে ফেলব না। শেষটা না শুনলে আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে। আমি মরে যাব। বলো না দাদা, মজার কাণ্ডটা কী ?' আমি কৃত্রিম উদ্বিগ্ন হয়ে কথাগুলো বলেছিলাম।

দাদা, তুমি আমার দিকে অপলক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলে, 'আমার কথা থাক। তোমার কথা বলো। তোমার কী খবর ?'

আমি আকাশ থেকে পড়ে বলেছিলাম, 'আমার কী খবর মানে! দাদা, কী বলতে চাইছ তুমি, হ্যাঁ ?'

'ভাই, আমাকে বললে তোমার কোনো বিপদ হবে না। বলো না!' দাদা তোমার চোখমুখ তখন কৌতুকে ভরা।

BanglaBook.org

আমি 'ধুত্তুরি' বলে বিছানা থেকে নেমে দৌড় লাগিয়েছিলাম। কয়েক কদম গিয়ে পেছনে ঘাড় ফিরিয়ে বলেছিলাম, 'যতই তাইরে নাইরে করো না দাদা, তোমার কাছ থেকে তোমার প্রেমিকার কাহিনি আমি বার করে নেবই নেব।'

আমার ঘরে আমি ফিরে এসেছিলাম দাদা, শুদ্ধবাংলায় যাকে বলে বর্ষণমুখর সেই দুপুরে। বিছানায় নিজেকে সমর্পণও করেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কী একটা উচাটন ভাব জেগে উঠল আমার মধ্যে। হইচই করে তুমুল একটা অস্থিরতা আমাকে গ্রাস করতে শুরু করল। যার জন্যে আমার অস্থিরতা, তার নাম তুষার।

সেদিন দ্বিতীয় পিরিয়ডের পর আর ক্লাস হলো না, শিক্ষক পরিষদের মিটিং নাকি। রাবেয়া বলল, 'ক্লাস তো হচ্ছে না, চল যাই বাতিঘরে।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'বাতিঘর! বাতিঘর আবার কী?'

'থাকিস ত গেরামে, গেরামের মাইয়া বাতিঘর চিনবি কেমনে! পান্তাভাত আর কেঁচা মরিচ লইয়া পইড়া থাকস, পৃথিবীর খবর তো রাখস না!' ব্যঙ্গ মিশিয়ে কথাগুলো বলেছিল সেদিন রাবেয়া।

আমি বলেছিলাম, 'হেঁয়ালি রাখ রাবেয়া। বল বাতিঘর কী।'

রাবেয়া বলল, 'চাটগাঁইয়া হয়েও তোরা নিজেদের অহংকারের জায়গা চিনিস না। বাতিঘর চট্টগ্রামের গর্বের জায়গা। বই দোকান। বলা যায় বইয়ের সমুদ্র বাতিঘর। চল যাই বাতিঘর দেখে আসি। তুই তো বই পড়তে খুব পছন্দ করিস। তোর ভালো লাগবে।'

রাবেয়া আমার সহপাঠী। ওর সঙ্গেই সেদিন আমি বাতিঘরে গিয়েছিলাম। সত্যি আমি দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম বাতিঘরে ঢুকে। এত বিশাল জায়গা নিয়ে এত এত বই! কত পাঠক-পাঠিকা গোটা লাইব্রেরি জুড়ে!

আমি বই দেখা শুরু করেছিলাম। দেখতে দেখতে একটা জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। সামনের তাকে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের বইগুলো সাজানো। সন্দীপন আমার প্রিয় লেখক। তাঁর উপন্যাসগুলোর অধিকাংশই আমার সংগ্রহে আছে! হঠাৎ 'সন্দীপনের ডায়েরি' বইটি চোখে পড়ল। হাতে নিয়ে পড়া শুরু করলাম। একী রে বাবা! সন্দীপন কী লিখে গেছেন তাঁর ডায়েরিতে! রক্ত-মাংস-পুঁজের ছড়াছড়ি সমস্ত ডায়েরি জুড়ে। তারপরও মোহগ্রস্তের মতো পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়ে যাচ্ছিলাম আমি।

কানের কাছে কে যেন ফিসফিসিয়ে বলল, 'বইটি ভালো না। পচা কথায় ভরপুর।'

চোখ তুলে দেখলাম—ঝাঁকড়া চুলের এক তরুণ আমার দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে আছে।

আমি নিস্পৃহ কণ্ঠে বললাম, 'সন্দীপন অন্যরকম। যাদের হজমের সমস্যা আছে, তাদের জন্যে সন্দীপন নিষিদ্ধ।'

BanglaBook.org

'কারও কারও পাকস্থলী লোহাও হজম করতে পারে।' পুরু লেন্সের ওপার থেকে চোখ দুটো নাচিয়ে তরুণটি বলেছিল।

'আপনি কি সন্দীপন পড়েছেন?' আমার সোজাসুজি প্রশ্নে প্রশ্নকর্তা একটু ভড়কে গেল বলে মনে হলো।

পরে নিজেকে সামলে নিয়ে তরুণটি বলেছিল, "অনেকবার। তাঁর প্রায় সব উপন্যাস তো আমার পড়া। এই যেমন 'একক প্রদর্শনী', 'এখন আমার কোনো অসুখ নেই', 'হিরোসিমা মাই লাভ', 'কলেরার দিনগুলোতে', 'এসো নীলবনে'—এসব।"

এরকম ক্ষেত্রে তরুণেরা স্ট্যান্টবাজি করে। এই তরুণটিও সেরকম করছে না তো! তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার মনে হলো—এ সেরকম নয়। তারপরও আমি মোক্ষম জায়গায় হাত দিলাম। বললাম, 'যারা সন্দীপন পড়ে তাদের তো অ্যালার্জি থাকার কথা নয়! আপনি তো দেখছি রক্ষণশীল।'

মৃদু হেসে তরুণটি কথা পাল্টেছিল। বলেছিল, 'কবিতা পড়েন না আপনি? এই যে দেখুন মন্দাক্রান্তার কাব্য, রণজিৎ দাশের কবিতার বই।' আমাকে কবিতার প্রতি প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিল সেদিন তুষার।

কথার এক ফাঁকে ও জানিয়েছিল তার নাম তুষার। কবিতা লেখার চেষ্টা করে। আর কী কী করে সে সেদিন বলে নি আমাকে।

আমাকে বাতিঘরের নেশায় পেয়ে বসেছিল। কাকতালীয়ভাবে তুষারের সঙ্গে দেখাও হয়ে যেতে লাগল আমার। আমি জানতে পারলাম—তুষার চিটাগাং মেডিকেলের শেষ বর্ষের ছাত্র। বাবা অধ্যাপক। নন্দনকাননের কোনো একটা বাড়িতে ওঁরা থাকেন। আমার সম্পর্কে জানতে চায় ও। আমি রেখেঢেকে তার কাছে আমার পরিচয় বলি।

কীভাবে কীভাবে যেন আমরা দু'জনে নিজেদের হৃদয়ে অপরের জন্যে একটু জায়গা দিলাম। আমি আমার হৃদয়-উঠোনটা নিকিয়ে পরিষ্কার করে একটা ভালোবাসার পিঁড়ি বিছিয়ে রাখলাম ওর জন্যে। ওর বেলায়ও হয়তো তা-ই। নইলে সে আমার সঙ্গে ঘন ঘন দেখা করার জন্যে এত আকুলিত হয়ে উঠত কেন?

দাদা, এসব কথা তোমাকে আমি বলতে পারি নি সেদিন। তাই তোমার জিজ্ঞাসার উত্তর না দিয়ে তোমার ঘর থেকে পালিয়ে এসেছিলাম। তোমার কাছ থেকে পালিয়ে এলে কী হবে, নিজের কাছ থেকে তো পালাতে পারি না আমি! কী করব আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ভেবে রেখেছিলাম—তুমি তো আছ। তুমি তো আমার শেষ ভরসা। তুষারকে যে আমি ভালোবাসি—সেকথা তোমাকে একদিন বলব বলে ঠিক করে রেখেছিলাম সে বৃষ্টিভেজা দুপুরে।

কিন্তু আমার ভালোবাসার কথাটি তোমাকে আর বলা হয়ে ওঠে নি। তারপর তো একদিন তুমি টুপ করে মারা গেলে! আমার পৃথিবীকে ঘন আঁধারে ডুবিয়ে দিয়ে অজানার পথে পা বাড়ালে তুমি! তবে তা অনেক পরের ঘটনা।

BanglaBook.org

এক বিষণ্ণ বিকেলে তুমি আমাকে ছাদে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। কার্নিশ ঘেঁষে দুটো চেয়ার পাতা ছিল। বেলার মাকে দিয়ে চেয়ার দুটো হয়তো তুমি আগেই আনিয়ে নিয়েছিলে।

তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে—আমাদের ছাদের অর্ধেকটা জুড়ে কৃষ্ণচূড়ার ডালপালা। সেদিন ডালে ডালে আগুন লেগেছিল। ফুলের আলোতে বিকেলের বিষণ্ণতা কেটে যাচ্ছিল।

সেই বিকেলে কোনো ভূমিকা না করে তুমি শুরু করেছিলে, 'ছুটির পর বাসায় ফিরে যাওয়া জরুরি—একথা বার বার বললেও যশোদার মধ্যে কোনো তাড়া লক্ষ করতাম না। কলিগরা একে একে চলে গেলে আমার ঘনিষ্ঠ হয়ে বসত যশোদা। খুব যে প্রেমের কথা বলত ও, তা না। একথা ওকথা বলতে বলতে ও আমার দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে থাকত। কখনো কখনো কোনো কথাই বলত না। শুধু তাকিয়ে থাকা—আসক্তিময় কোমল চোখে।' একটু দম নিয়ে তুমি আরও বলেছিলে, 'ছুটির পর মাঝেমধ্যে সমুদ্রের পাড়ে বেড়াতে যেতাম আমরা। বেড়িবাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে নির্বাক চোখে সে বিশাল জলরাশির দিকে তাকিয়ে থাকত। সন্ধে নাগাদ ফিরে আসতাম আমরা। যশোদাকে বাসে তুলে দিয়ে বাড়ির পথ ধরতাম।'

'সবাই বিশ্বাস করতে শুরু করল যশোদাকে আমি বিয়ে করব। করতামই তো!' কিছুক্ষণ পর তুমি বলেছিলে।

'বিয়ে করলে না কেন দাদা?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'বিয়ে করব কাকে? যে চলে গেল, তাকে কী করে বিয়ে করি!'

'চলে গেলেন মানে?'

'আত্মহত্যা করল যশোদা, একদিন।' বলেই দাদা ঝর ঝর করে কেঁদে দিলে তুমি।

'আত্মহত্যা!' স্তম্ভিত আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

দাদা নির্বাক থেকেছ তুমি অনেকক্ষণ। হঠাৎ গা ঝাড়া দিলে তুমি। যেন গভীর তন্দ্রা থেকে জেগে উঠলে। জানালার দিকে আঙুল তুলে বললে, 'ওই যে নারকেল গাছটা দেখছ, সেটা যশোদার দেওয়া। একদিন থলেতে করে চারাগজানো নারকেলটা এনে বলেছিল—কিশোরগঞ্জের নারকেল। বাবা এনেছিল। ঘরে কয়েক দিন পড়ে থাকার পর শিং গজিয়েছে। আমাদের তো মাটি নেই। তোমার আছে। ঘরের পাশে লাগিয়ে দিয়ো।'

এত দিন পরে বুঝলাম দাদা কেন নারকেল গাছটির প্রতি এত গভীর প্রীতি অনুভব করতে তুমি! কেন নিবিড় স্পর্শ নিতে চাইতে তুমি গাছটির!

আমি করুণ গলায় বললাম, 'আত্মহত্যার কথা বললে না যে!'

BanglaBook.org

সেদিন পতেঙ্গার সীবিচে ঘুরতে ঘুরতে অনেকটা সময় পেরিয়ে গিয়েছিল। ঘন হয়ে আঁধার নেমেছিল। প্রায় জনশূন্য একটা বাসে তুলে দিয়েছিলাম যশোদাকে। এখন এ অঞ্চলের যে রাস্তাঘাটগুলো দেখছ, এত লোকজন, এত কলকারখানা, সে সময় এরকম কিছুই ছিল না। লক্কড়ঝক্কড়মার্কা একটা দুটো বাস ভাঙা রাস্তা দিয়ে শহর পর্যন্ত যাতায়াত করত।'

তারপর বহুক্ষণ চুপচাপ থাকলে তুমি। তারপর বললে, 'পরদিন শুনলাম যশোদা আত্মহত্যা করেছে, তার বেডরুমে।'

'কী হয়েছিল আসলে!' আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

'পথে কিছু গুন্ডা বাস থেকে সে-রাতে তাকে নামিয়ে নিয়েছিল। বাসায় ফিরে ফ্যানে ঝুলিয়ে দিয়েছিল নিজেকে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী! যার সব শেষ হয়ে গেছে তার তো আর তারপর থাকতে পারে না।' চাপা দীর্ঘশ্বাস তোমার বুক চিরে বেরিয়ে এসেছিল সেদিন।

আমি হালকা চালে বলেছিলাম, 'তারপর তোমার বাবা তোমাকে বিয়ে করিয়ে দিল। দেরিতেই বিয়ে হয়েছিল তোমার। তাই তো তোমার বয়স এত বেশি, বাবার এত কম।'

তুমি ম্রিয়মাণ ছিলে তখন। তোমার চোখমুখ জুড়ে বিপন্নতার ঝড়।

আমি চোখে ঝিলিক তুলে বলেছিলাম, 'আমার ঠাকুমা তোমাকে কিছু বলে নি কোনোদিন?'

'না, শ্রীমতী এক অসাধারণ গুণের নারী ছিল। সবকিছু সে আন্দাজ করতে পারত, কিন্তু কোনোদিন মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞেস করে নি তোমার ঠাকুমা।' একটু দম নিয়ে তুমি আবার বলেছিলে, 'ও জিজ্ঞেস না করলে কী হবে, আমি যে ভেতরে ভেতরে পুড়ে খাক হয়ে যেতাম। বিবেক আমাকে কুরে কুরে খেত। মনে হতো আমি শ্রীমতীকে ফাঁকি দিচ্ছি। তো এইভাবে আমার জীবন গেল। মনে গভীর বেদনা নিয়ে তোমার ঠাকুমা আমার ঘর করে গেল। না পারলাম আমি ঘাটের হতে, না হতে পারলাম আমি ঘরের।'

আমি নীরবে ছাদ থেকে নেমে এসেছিলাম সেই বিকেলে।

তারপর তো তুমি একদিন মারা গেলে দাদা। আমি স্বজনহীন হয়ে পড়লাম।

তুষারের সঙ্গেই আমার বিয়ে হয়েছে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়েই বিয়েটা হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। তুষার তো বনেদি পরিবারের ছেলে! টাকাপয়সাও অনেক তাদের। চট্টগ্রাম শহরের নন্দনকাননে নয়নাভিরাম বাড়ি তাদের। ওর বাবা এক ব্যাংক ম্যানেজারের কন্যার সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে দিতে প্রথমে রাজি ছিলেন না। তুষারের শক্ত অবস্থানের কারণে বাবা তার নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছিলেন।

Banglabook.org

তুমি বিশ্বাস করো দাদা, শ্বশুরবাড়িতে আমি পরম সুখে ছিলাম। শ্বশুর আমাকে নিজের মেয়ের মতন দেখেন, শাশুড়ি শাশুড়ির মতো আচরণ করেন না, যেন তিনি আমার মা। আর তুষার তো আমাকে ভালোবেসেই বিয়ে করেছে; সুতরাং কী রকম সুখের দিন আমি পার করছিলাম ভেবে দেখো দাদা। কিন্তু এই সুখ আমার বেশিদিন টিকল না। টিকতে দিল না আমার ভালোবাসার তুষার।

ডাক্তার মানুষ। ঠিকঠাক সময়ে বাড়ি ফিরত না সে। আমি প্রথম প্রথম কিছু মনে করতাম না। রোগী দেখার তো কোনো রাতবিরাত নেই।

এক রাতে সে বেহেড মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরল। তার মা-বাবা তখন ঘুমিয়ে। আমিই দরজা খুলে দিয়েছিলাম। ড্রাইভার তুষারকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল।

'সীমা, তুমি কোথায় ?' বলে ধপাস করে মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল তুষার।

আমি হতবাক। উথালমাতাল ঢেউকে বুকের তলায় চেপে রেখে তুষারকে বেডরুমে নিয়ে গিয়েছিলাম দাদা।

পরদিন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'সীমা কে ?'

তুষার এড়িয়ে গিয়েছিল আমার জিজ্ঞাসাকে। ওকে আগে কখনো মদ খেতে দেখি নি। ভীষণ রকমভাবে মদ খাওয়া শুরু করল সে। তার মা-বাবা অসহায়। বয়স হয়েছে তাঁদের। তুষারের সামনে প্রতিবাদ করার ভাষা ও সাহস তাঁদের নেই। আমার অবস্থা ভেবে দেখো তুমি! বাবা চাকরি থেকে রিটায়ার করেছে। প্রশান্তের পড়াশোনা শেষ হয় নি এখনো। মা সংসারের ঘানি টেনে যাচ্ছে। বাবা সর্বস্ব দিয়ে আমার বিয়ে দিয়েছিল। তারা জানে—আমার মতো সুখী পৃথিবীতে খুব কম মেয়েই আছে। আমি কীভাবে জানাই তাদের আমার দুঃখের সংবাদটি!

আমার জীবনের মোড়টা ঘুরে গেল দাদা।

তুষার রাতবিরাতে বাড়ি ফিরে, কখনো মাতাল, কখনো গম্ভীর। আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা সে ভুলে গেছে।

একদিন ড্রাইভার বলল, 'কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম, স্যারকে সামলান।'

আমি নিস্পৃহ চোখে তার দিকে তাকিয়েছিলাম। ড্রাইভার আরও বলেছিল, 'সীমার সঙ্গে স্যারের সম্পর্কের কথা গোটা শহরে ছড়িয়ে গেছে।'

আমি মাথা নিচু করে ছিলাম সেদিন।

দাদা, তুমি বলো আমি এখন কী করব ? বাপের বাড়িতে ফিরে যাব ? মা-বাবা তো জানে—আমি পরম সুখে আছি। ভালোবাসার বিয়ে যে!

নাকি আত্মহত্যা করব! তোমাকে চুপে চুপে বলি দাদা, আমি আত্মহত্যা করতে পারব না। আত্মহত্যার কথা মনে হলে নিকষ কালো ভয়ংকর একটা রোমশ বাহু আমার দিকে এগিয়ে আসে। আমি ভয়ে চোখ বুজি। আত্মহত্যা আমি করতে পারব না দাদা।

BanglaBook.org

বেশ কিছুদিন আগে থেকেই আমি আমার বিছানা আলাদা করে ফেলেছি। এখন আমি আমার বিছানার মাঝখানে জোড়াসনে বসে আছি, যেমন করে তোমার বিছানায় আমি বসতাম। সন্ধে এখন। আজ শুক্রবার। তুষারের চেম্বার বন্ধ। তবুও গায়ে কড়া সেন্ট মেখে তুষার বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি নির্বাক তাকিয়ে আছি তার দিকে। আমি জানি তুষার কোথায় যাবে।

কোথায় যাচ্ছ ? কার কাছে যাচ্ছ ?—এ রকম প্রশ্ন করার সকল অধিকার আমার থাকলেও জিজ্ঞেস করার সাহস আর রুচি আমি হারিয়ে ফেলেছি। এর আগে বেশ কয়েকবার তুষার আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ফেলেছে। বলেছে, 'আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবে না। এ বাড়ির বউ তুমি, বউ হয়েই থাকো। ঘরের বাইরে আমি কী করছি তার খবর নিতে গেলে তোমার খবর করে দেব আমি।'

দাদা, ভেবে দেখো কী অশ্লীলতা আর কী বীভৎসতা মিশে আছে তুষারের কথায়! সে আমাকে ঘরের বউ বলেছে, কিন্তু আমি তো একদিন তার প্রেমিকাও ছিলাম। তুষারকে ভালোবেসে বিয়ে করে কী মারাত্মক ভুলই না করেছি আমি! এখন আমার ফেরার পথ নেই—না সুস্থ জীবনের কাছে, না মা-বাবার কাছে, না ভালোবাসাময় তুষারের কাছে। জীবনের সবকিছু এখন আমার কাছে অধরা হয়ে গেছে।

দাদা, তোমাকে একটা প্রশ্ন করে আমি আমার চিঠি শেষ করব। তুমি যশোদা দেবীকে না পেয়ে ভীষণ অতৃপ্তিতে ভুগেছ, আমি তুষারকে পেয়ে যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছি। কোনটা শ্রেয় দাদা ? পাওয়াটা, না না-পাওয়াটা ? কোনটা শ্রেয়তর দাদা, না-পাওয়ার যন্ত্রণায় তিল তিল করে ক্ষয় হওয়া, না পাওয়ার যন্ত্রণায় তিল তিল করে ক্ষয় হওয়া ? তুমিও প্রেম করেছ দাদা, আমিও। আমি প্রেমিককে পেয়েছি, আর তুমি প্রেমিকাকে পাও নি। পাওয়া এবং না-পাওয়ার পরিণাম কি এক হতে পারে ? অথচ দেখো, দুজনের প্রাপ্তি সমান। প্রাপ্তির নাম—দুর্মর হাহাকার। তোমার মধ্যে না-পাওয়ার হাহাকার ছিল, আমার মধ্যে প্রাপ্তির আর্তনাদ। কোনটা কাঙ্ক্ষিত দাদা ? তুমিই বলো, এখন আমি কী করব দাদা ? বলো, বলো তুমি...।

ইতি
তোমার ভালোবাসার
শান্তা

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সোনালি আঁধার

অলকার কেবলই মনে হয়, ভোর একটা ঘষা কাচের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। আবছা এবং রহস্যময়।

এটা সত্য, কন্যা সঙ্গীতার সঙ্গে তার যে বন্ধুত্ব ছিল, তার শতভাগের পাঁচভাগও ভোরের সঙ্গে নেই। মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে চলে যাওয়ার পর ভোরের সঙ্গে তার দূরত্বের ব্যাপারটি আরও বেশি করে চোখে পড়তে লাগল অলকার।

বাড়িটি খাঁ খাঁ করে। অজিত বাইরে বাইরে। ওষুধের ব্যবসা। ভারত, ঢাকা, চট্টগ্রাম—অবিরাম ঘোরাঘুরি তার। যে ক'দিন চট্টগ্রামে থাকে বলতে গেলে ওষুধের দোকানেই পড়ে থাকে অজিত। হাজারিগলিতে ওষুধের দোকান অজিতের। রাতের বেলাতে যা দেখাসাক্ষাৎ অলকা-অজিতে আর ভোরে।

খাবার টেবিলে কথা হয় টুকটাক, তাও কেজো। অজিত জিজ্ঞেস করে, 'তোর পড়াশোনা কেমন চলছে?'

ভোর চোখ তুলে চায়, মৃদু একটু হাসে।

আর ক'বছর লাগবে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরোতে?

মুখ খোলে ভোর, 'এই তো।'

অজিত খাওয়ায় মন দেয়।

নিজের পাতে ইলিশের টুকরা তুলে নিতে নিতে অলকা বলে, 'এত হুঁ হাঁ করে কী জবাব দাও তুমি! দু'-চারটা কথা মুখ খুলে বলতে তোমার অসুবিধেটা কোথায়?'

ভোরের মুখে সেই মৃদু হাসি। চোখের চাউনি ভাষাহীন।

অলকা ভাবে—ভোর তো বোবা নয়। কেন যে সে বোবার মতো আচরণ করে! তরুণ সে। ছটফটিয়ে কথা বলার এই তো সময়। কিন্তু ভোর খলবল করে কথা বলে না। সে মা-বাবা কারও সঙ্গে তেমন কথা বলে না। অথচ মোবাইলে কল এলে হড়বড় করে কথা বেরোয় তার মুখ থেকে, হা হা করে হাসে। তার যত কার্পণ্য মা-বাপের সঙ্গে কথা বলায়। ভোর কেন এরকম হয়ে গেল—বুঝে উঠতে পারে না অলকা।

অথচ ভোর এরকম ছিল না। খলখল করে কথা বলত, হাসি-ঠাট্টা করত। একদিন অলকা বান্ধবী নন্দার সঙ্গে মোবাইলে কথা বলছিল, 'বুঝলে নন্দা, গতকাল নিউমার্কেটে গেলাম একটা শাড়ি কিনব বলে, দোকানদার যা দাম হাঁকাল না!' একটু উঁচু গলাতেই বলছিল অলকা।

BanglaBook.org

মা শুনতে পায় মতো করে ভোর বলেছিল, 'মোবাইলটা রেখে খালি গলায় কথা বলো মা। তোমার বান্ধবীও শুনতে পাবে, দোকানদারও। যা উঁচু গলা তোমার! খালি খালি মোবাইলে টাকা খরচ!'

ছেলের কথা শুনে লজ্জা পেয়েছিল অলকা, গলা নামিয়েছিল। আর একদিন খাবার টেবিলে রুইমাছের মাথাটি খাওয়ার জন্যে অলকাকে খুব সাধাসাধি করছিল অজিত। অলকা না না করছিল। বলছিল, 'তুমি খাও, তুমি খাও গো।'

পাশে ভোর। সাধাসাধির মাঝখানে ভোর বলে উঠেছিল, 'বাবা, মা তো মাথা অনেক দিন খেয়েছে। তোমারও মাথা খাওয়ার অভিজ্ঞতা কম নয়। এবার আমাকে সুযোগটা দাও।'

অলকা-অজিত চমকে তাকিয়েছিল ভোরের দিকে।

ভোরের কথার মানে কী! অজিত ভাবে—আমার তো প্রেমিকা ছিল, ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়। বিয়ে হয় নি তার সঙ্গে। ফষ্টিনষ্টি শেষে অলকাকে বিয়ে। জেনে গেছে নাকি ভোর! অলকা ভাবে—মা-বাবা কোর্ট থেকে কৌশলে ফিরিয়ে না আনলে হারাধনের সঙ্গেই তো আজ ঘর করার কথা তার। ভোর কী কিছু আঁচ করেছে!

ওরা দুজনে ভাবছে নিজেদের মতো করে। ভোর নির্বিকার খেয়ে যাচ্ছে।

ছটফটে ভোর হঠাৎ করেই একদিন চুপচাপ হয়ে গেল। কী রকম যেন একা একা থাকতে পছন্দ ভোরের। নিজের ঘরে হয় বইপত্র পড়ছে, নয় ল্যাপটপ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি। খেতে ডাকলে টেবিলে আসে। কোনো পছন্দের খাওয়া নেই। যা দেয় তা-ই পাত থেকে মুখে তোলে। অথচ একসময় মায়ের কাছে আবদার করত, 'মা, কাঁকড়া খেতে খুব ইচ্ছে করছে। ডালের সঙ্গে কাঁকড়া খুব মজার।'

আর আজ কাঁকড়ার বড় বড় ঠ্যাং পাতে তুলে দিলেও ভোর নির্বিকার। উদাসীন চোখে একপলক মায়ের দিকে তাকিয়ে দাঁড়া নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

আগে বলত, 'মা নাস্তা দাও। খিদে লেগেছে।' নাস্তা দিতে দেরি হলে ভারী গলায় বলত, 'লাগবে না তোমার নাস্তা। রাবণের চিতা নিভে গেছে। এখন লাকড়ি দিলেও চিতার আগুন জ্বলবে না।'

সে ভোর এখন সকাল বা সন্ধে কোনো বেলাতেই নাস্তা চায় না। দিলে খায়, না দিলে চুপচাপ।

অলকা দিশে পায় না। ভোর হঠাৎ এত চুপচাপ আর নির্বিকার হয়ে গেল কেন? ছেলের দিকে চাইলেই অলকার বুকে মুগুরের বাড়ি পড়ে।

অজিত ভাবে—জেনারেশন গ্যাপ। নানা কাজকর্ম আর ধান্ধায় ব্যস্ত থাকে সে। ছেলের সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলার ফুরসত পায় না। সকালে যখন সে বাসা থেকে বের হয়, ভোর তখন ঘুমে। গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশোনা ভোরের। শেষ রাতে ঘুমাতে

BanglaBook.org

যায়। রাতের বেলাতেও কখনো দেখা হয়, কখনো হয় না। বেশি রাত হলে ছেলেকে খাইয়ে টেবিলে খাবার ঢাকনা দিয়ে শুতে যায় অলকা। ছেলের দরজা তখন বন্ধ। এইভাবে অজিতের আলাদা একটা জগত তৈরি হয়ে যায়। আলাদা জগৎ তৈরি করে ভোরও।

ছেলের এই উদাসীনতা বা মিতবাগিতা নিয়ে অজিতের সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করে না অলকা। তার মনে হয় ছেলের বিষয়ে আলোচনা করার যথার্থ লোক অজিত নয়। অজিত নিজকে নিয়ে ব্যস্ত। তার টাকা বাড়ছে; তার কথায় আর আচরণে দেমাক ফুটে উঠছে। পঞ্চাশছোঁয়া বয়স অজিতের। ক্ষয়ে যাওয়া শরীর, পাংশুটে। বিয়ের সময় দেখতে তেমন খারাপ ছিল না। ঘোর শ্যামলার দিকে রঙ অজিতের। গোঁফটা ভালোই মানাত লম্বা নাকের অজিতকে। এখন সেই গোঁফ সাদা। শ্যামলা রঙের ওপর ছোপ ছোপ কালো দাগ, সমস্ত শরীর জুড়েই। চুল তো পেকেছে অনেক আগে। সেই চুলে কলপ লাগায়, কালো চুল আর সাদা গোঁফের অজিতকে কিম্ভূতকিমাকার মনে হয়। যেন এক হুলো।

ভাটির টান অজিতের শরীরে। ভাটির টান লাগা পুরুষের মধ্যে ভোগের পাগলামি বাড়ে। এ ধরনের পুরুষেরা বুঝতে পারে—তাদের সময় ফুরিয়ে আসছে। তাই ণত্ব-ষত্ব জ্ঞান হারিয়ে চারপাশের ভোগ্যবস্তুকে শুধু কাছে টানে। অজিতেরও সেই অবস্থা। প্রায়দিন অলকাকে অজিতের দাবি মেটাতে হয়। শরীরেরও দম নেওয়া চাই। অজিতের কারণে অলকার শরীর বিশ্রাম পায় না। ফলে ঘৃণা বাড়ে। ঘৃণা অবহেলার রূপ নেয়। বিরক্ত অলকা মাঝেমধ্যে অজিতকে প্রত্যাখ্যান করে। অলকার প্রত্যাখ্যান অজিতকে বহির্মুখী করে।

ইদানীং অজিত রঙিন জামা পরা শুরু করেছে, তার জামাকাপড় থেকে কড়া সেন্টের ভুরভুরে গন্ধ বেরোয়। অলকার মনে হয়—অজিত বাইরে চোখ দিয়েছে। আগের মতো নিত্যরাত খাবলাবার আগ্রহ দেখায় না অজিত।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব বাড়ে।

ভোর হয়তো সবটা জানে না, তবে কিছুটা যে অনুমান করে না এমন নয়। তার মনে হয়—মা-বাবার মধ্যে কিছু-একটা হয়েছে। দুজনের বিশ্বাসের মধ্যে কোনো কারণে ফাটল দেখা দিয়েছে। প্রকৃত কারণ সে জানে না। একদিন কারণ এসে ভোরের হাতে ধরা দেয়।

হঠাৎ ছুটি হয়ে যাওয়ায় সেদিন দুপুরেই ভোর চলে এল ঘরে। কী জানি কেন বেল না টিপে দরজার হাতলে চাপ দিল ভোর। টুপ করে দরজা খুলে গেল। আনমনেই ঘরে ঢুকল ভোর। রান্নাঘর পেরিয়ে তাকে নিজের ঘরে যেতে হয়। তার বেডরুমের পাশেই মা-বাবার ঘর। মাথা নিচু করে রান্নাঘর পেরোতেই কানে এল— 'আঃ মেসো, কী করছেন ?' আলুলায়িত কণ্ঠ চম্পার। চট করে চোখ তুলল ভোর। দেখল—বাবা চম্পার বুকে হাত দিয়ে চটকাচটকি করছে। ভোরের ঘরে ঢোকা দুজনের কেউই টের

BanglaBook.org

পায় নি। দ্রুত এদিক ওদিক তাকাল ভোর। মা কোথায় ? মাকে কোথাও দেখল না সে। ঝিম ধরে একটুক্ষণ দাঁড়াল ভোর। তারপর কাঁপা পায়ে বেডরুমে চলে এল। মা-বাবার বেডরুমের পাশ দিয়ে আসতে আসতে দেখল অ্যাটাচড্ বাথরুম বন্ধ, ভেতরে শাওয়ারের আওয়াজ। অলকা শাওয়ার ছেড়ে স্নানে মগ্ন।

সেই দুপুরে ভোর অলকাকে বলল, 'ভাত খাব না। বাইরে খেয়ে এসেছি।'

রাতে তাইরে নাইরে করে সামান্য কিছু মুখে দিল ভোর। সকাল-সকাল শুয়ে পড়ল। সেই রাতে স্বপ্নটা আবার দেখল ভোর। একটা কুচকুচে কালো হুলো, তার আবার ইয়াবড় সাদা গোঁফ, ধবধবে সাদা কেশওয়ালা বিলেতি এক কুকুরকে তাড়া করছে। লম্বা কেশের মাদি কুকুরটি প্রাণপণে ছুটে চলেছে, তার পিছু পিছু সাদা গুঁফো কালো হুলোটি। একটা সময়ে বেড়ালটি ঝাঁপিয়ে পড়ল কুকুরটির ওপর। অদ্ভুত ভঙ্গিতে ধারালো দাঁত দিয়ে কুকুরটিকে খাবলাতে লাগল বেড়ালটি। কুকুরটি তীব্র স্বরে আর্তনাদ করে উঠল। ঘুম ভেঙে গেল ভোরের। সারা গায়ে ঘাম। ডান গালের পাশ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে। নিথর দুটো হাত শরীরের দু' পাশে ছড়ানো।

অনেকক্ষণ পর ভোরের শরীরে চেতনা এল। এ স্বপ্ন সে আগেও দেখেছে, বার বার অনেকবার। তবে সেটা তাড়ানো পর্যন্ত। সাদা গুঁফো বেড়ালটি বিলেতি মাদি কুকুরটাকে তাড়াচ্ছে, এই পর্যন্ত। আজকে শেষটা দেখল। শেষটা কেন ? এই শেষের পরেও তো ঘটনা থাকতে পারে। কে জানে সেই পরের ঘটনা কী!

এই স্বপ্নটি প্রথম যেদিন দেখল ভোর, পাত্তা দেয় নি। সাইন্সের ছাত্র, উড়িয়ে দিয়েছিল গোটা স্বপ্নটাকে। স্বপ্নটা হুবহু সে একদিন পর আবার দেখল, তারপর আরও একদিন। ভোর ভয় পেয়ে গেল। তার যুক্তিনির্ভর মস্তিষ্ক তাকে খুব সাপোর্ট করল না। স্বপ্নটা নিয়ে ভাবা শুরু করল ভোর। কূলকিনারা পেল না। এই স্বপ্ন এবং স্বপ্নঘোর তাকে পেয়ে বসল। তার চাঞ্চল্য কমে এল। তার কথা কমে এল। তার চারপাশে শুধু কালো বেড়াল আর সাদা মাদি কুকুরের স্বপ্নটি ভনভন করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। স্বপ্নটা দেখত সে ভোরের দিকে। স্বপ্নটি দেখার পর তার আর ঘুম হতো না। চিৎ হয়ে শুয়ে নির্ঘুম চোখে সকালের জন্যে অপেক্ষা করত ভোর।

বাবার দুপুরের চটকাচটকি আর আজকের স্বপ্নের পরিণতি কিসের ইঙ্গিত করছে ? বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছে ভোর। কিন্তু কোনো সমাধানে আসতে পারছে না। কী মানে এই স্বপ্নের ? সাদা কুকুরের আর্ত চিৎকারের ? সাদা গুঁফো কালো বেড়ালটাই বা কে ? বিড়ালের আবার গোঁফ হয় নাকি ? উফ্! কিছুই বোঝা যাচ্ছে না! যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে ভোর।

ভোর ঠিক করে মাকে গত দুপুরের কথা বলবে না। বলে কী লাভ! সংসারের যন্ত্রণা ছাড়া! বাবা মায়েতে তৃপ্ত নয়। অথবা মা বাবায়। মাকে বললে বাবার দ্বিচারিতা, তৃচারিতা বা বহুচারিতা কমবে ? মনে হয় না। বাবা বহু আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বেডরুম থেকে মায়ের গজরানোর মানে এত দিনে বুঝতে পারে

BanglaBook.org

ভোর। কিন্তু তার কী করার আছে এই মুহূর্তে! বাপকে শাসাতে পারে। তাতে লাভ? বাবা লোভের কারবারি এখন। শরীর-লোভীদের কাছে সন্তান-স্ত্রীর মূল্য ঠুনকো। মাকে বললে সংসারের প্রবলেম বাড়বে, ভারসাম্য ধসে যাবে। ভোর নিজেকে আরও গুটিয়ে নেয়।

সংসারের ভারসাম্য যেন সেতারের সূক্ষ্ম তার। আনাড়ি আঙুল সেই তারে লাগলেই ক্যাঁৎ কোঁৎ আওয়াজ। শব্দের তাণ্ডব তখন। অলকা-অজিতের সংসারও ব্যতিক্রম নয়। অজিত-চম্পার ব্যাপারটি অলকার ছন্দোময় সংসারের ভারসাম্যে আনাড়ি আঙুলের তাণ্ডব ঘটাবে। তার চেয়ে এই ভালো, দেখে যাওয়া। ভোর নিজের মা-বাবার দাম্পত্যজীবনকে দেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

২

চম্পার মা অলকার সঙ্গেই বাপের বাড়ি থেকে এসেছিল। মেয়ের কষ্ট হবে বলে বাবাই পাঠিয়েছিল চম্পার মাকে। চম্পার মা লতাপাতায় কী রকম আত্মীয় যেন অলকার বাবার। কোনো এক দুঃসময়ের ছোট্ট মেয়ে চম্পাকে নিয়ে অলকার বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল চম্পার মা।

ছোট্ট চম্পাকে নিয়েই অলকার সংসারে ঢুকেছিল চম্পার মা। একটা সময়ে মারাও গেল সে। মরার সময় দশ বছরের চম্পাকে অলকার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে চম্পা এবাড়ির কাজের মেয়ে হলে কাজের মেয়ে, আত্মীয় হলে আত্মীয়। অলকাদের বেডরুমের ওপাশে গেস্টরুম। সেইখানে মায়ের সঙ্গে থাকত চম্পা, এখন একা থাকে।

চম্পা যখন এ বাড়িতে আসে, তখন টিঙটিঙে শরীর, মোটা পেট। নাকের নিচে ঘা। মাথার চুল কামানো। চোখের কোনায় পিচুটি লেগে থাকত হরদম। হাফ প্যান্ট পরে মায়ের পিছে পিছে ঘুরত।

এখন সেই চম্পাকে আর চেনা যায় না। ধান ফুটে যেন খই বেরিয়েছে। যে আগে চম্পাকে দেখেছে, সে এখন বিস্ময়ভরা চোখে চম্পাকে দেখে। কী অবাক কাণ্ড গো! মুদির দোকানদার, হকার, পাড়াপড়শি চম্পার দিকে অবাক চোখে তাকায়। আর তাকায় অজিত। অন্যরা অপলক চোখে তাকায়, অজিত তাকায় চোরাগোপ্তা।

মাঝদুপুরে ঘরসংসার শুনশান হয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে আয়নার সামনে দাঁড়ায় চম্পা। নিজের স্তন দেখে বিমূঢ় হয় সে। এগুলো কি তার স্তন! স্নানঘরে ঊরু দেখে, নাভি দেখে। সে চোখ ফিরিয়ে নেয় তার শরীর থেকে। কাপড়ে ঢেকেঢুকে স্নানঘর থেকে বের হয় সে।

মাকে সেদিন তীক্ষ্ণ গলায় বলতে শুনল ভোর, 'ওরে সর্বনাশী! এত রূপ কোথায় ছিল তোর! রেখে ঢেকে চল, রেখে ঢেকে চল। সংসারে আগুন লাগাবি।'

BanglaBook.org

সে-রাতে ভোর আবার স্বপ্ন দেখল। এ-রাতে স্বপ্নটা আরও একটু এগোল, মাদি কুকুরটা বলছে, 'আমাকে মেরো না, মেরো না গো। আমাকে ছেড়ে দাও।'

সংসারে সত্যি একদিন আগুন লাগল। সে আগুনের কথা অলকা জানল না। সে আগুনের উত্তাপ উপভোগ করতে লাগল অজিত, হলকায় পুড়তে লাগল ভোর।

চম্পার গায়ে নতুন জামা উঠল, বুকে ঝুলল রংবাহারি ওড়না।

অলকা বিষ চোখে জিজ্ঞেস করল, 'এসব কী?'

অজিত বলল, 'টেরিবাজার দিয়ে আসছিলাম। চোখে পড়ল। কিনতে ইচ্ছে করল। আমাদের তো অল্পবয়সী মেয়ে নেই! চম্পার জন্যে কিনে আনলাম তাই।'

মূক অলকা। ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে থাকে অজিতের দিকে।

এরপর থেকে অলকা চোখ রাখল চম্পার ওপর। অজিতকে ঘিরে তার সন্দেহ বাড়তে লাগল।

কিন্তু অলকার বেশ ক'মাসের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী নজরে কিছুই পড়ল না। চম্পা ঘরকন্নার কাজকামে মগ্ন, অজিত ব্যবসায়ে। তারপরও অলকার বুকের তলা থেকে বিষের কাঁটাটি সরে না। শুধু খচ খচ করে। রক্তও ঝরে একটু আধটু। সন্দেহ আর অভিমান অলকাকে কুরে কুরে খায়। চম্পার আচরণে বেচাল দেখলেই তো চম্পাকে ধরত! চম্পার প্রতি অজিতের পক্ষপাতিত্ব থাকলেই তো অলকা সোচ্চার হতো! কিন্তু অজিত চম্পার প্রতি উদাসীন। পোশাকআশাক আনার কৈফিয়ত দেওয়ার পর অজিত দু'-চার দিন অপরাধীর মতো চলাফেরা করল ঘরে। যেন চম্পার জন্যে জামা-ওড়না এনে মস্তবড় অন্যায় করে ফেলেছে সে। আর কোনোদিন আনব না—এরকম চোখ করে অলকার দিকে বার বার তাকাল। অজিতকে সন্দেহ করার কোনো কারণই খুঁজে পেল না অলকা।

তবে ইদানীং বিছানায় অজিতের আগের মতো খাই খাই ভাব কমে এসেছে। প্রতিদিনের বিরতি সপ্তাহে নেমে এল। কোনো কোনো সপ্তাহে অজিত হাতও দেয় না অলকার গায়ে। তাতে অলকার অভিমান জমা হয়। কোলবালিশটা নিয়ে অলকা পাশ ফিরে শোয়। ভাবে—এই বুঝি অজিত কাছে টানবে। কিন্তু অজিত কাছে টানে না। অজিত জেগে থেকে, ঘুমের ভান করে। একটা সময়ে গভীর ঘুমে তলিয়ে যায় অলকা। অজিত চিৎ হয়ে চোখ খোলে। অপেক্ষা করে আরও গভীর রাতের জন্যে।

সে-রাতে বড় তেষ্টা পেল ভোরের। দেখল—তার টেবিলের পানির বোতলটা খালি। দরজা খুলে ডাইনিং রুমে এল পানি খেতে। আসতে আসতে দেখল মা-বাবার বেডরুমের দরজাটা সামান্য খোলা। ফাঁক দিয়ে নীল আলোর বিছানায় মাকে দেখল, বাবাকে দেখল কি? পানি খেতে খেতে ভাবল ভোর।

এই সময় চম্পার ঘর থেকে নারী-পুরুষের ফিসফিসানি ভোরের কানে এল—আঃ! চুপচুপ আস্তে—এসব।

BanglaBook.org

কী, কী শুনল সে! মা তো তার বিছানায়। তাহলে চম্পার ঘরে নারীকণ্ঠটি কার? নিশ্চয়ই চম্পার। এ বাড়িতে পুরুষ তো দুজন—একজন সে, অন্যজন তার বাপ। সে নিজে তো এই ডাইনিং টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে। তাহলে চম্পার ঘরে পুরুষকণ্ঠটি কার? বাবাকে তো বিছানায় দেখলাম না! ভাবতে ভাবতে ভোরের মাথা আউলা-ঝাউলা হয়ে গেল। মাথার ভেতরে ঝড়, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত। কানের পাশ দিয়ে জেট বিমান তীব্র তীক্ষ্ণ আওয়াজে চলে গেল। তার হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে পড়ে যেতে চাইছে। মাথার কোষে কোষে রেলগাড়ির ঝিক ঝিক শব্দ।

পানি খাওয়া রেখে ভোর দ্রুত ফিরল তার ঘরে। সে দিশেহারা। সে চিৎকার দেবে? মা, তোমার সংসারে আগুন লেগেছে মা, ওঠো! না চম্পার ঘরের সামনে গিয়ে 'হারামজাদা' বলে তীব্র স্বরে চেঁচিয়ে উঠবে?

ভোর কিছুই করল না। অন্ধকারে সিলিংয়ের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল শুধু। একটা সময়ে উত্তেজনা কমে এল ভোরের। চোখ জড়িয়ে এল।

সে ওই স্বপ্নটিই আবার দেখল। এবার মাদি কুকুরটির আর্তনাদ নয়, নয় গুঁফো বেড়ালের তাড়া। সে দেখল কালো হুলোটি ডাইনিং টেবিলে উঠে পানিভর্তি গ্লাসে কিসের যেন একটা বড়ি ফেলল। তারপর হুলোটি মাদি কুকুরটির চোয়াল চেপে ধরল। ওষুধ মেশানো পানির গ্লাসটি উপুড় করে চেপে ধরল কুকুরটির মুখে। কুকুরটির মুখ থেকে অ্যাঁ অ্যাঁ গোঙানি ছাড়া আর কিছুই বেরোল না।

ভোরের ঘুম ভেঙে গেল। সূর্যের তির্যক আলো তখন ঘরে। সেই আলোর রং সোনালি না নীল বুঝে উঠতে পারল না ভোর।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আহব ইদানীং

আমি কাউল্যা। কাউল্যা আমার আসল নাম নয়। মা-বাবা নাম দিয়েছিল মোহাম্মদ কালামউদ্দিন। কালামউদ্দিন নামটা কখন ঘুচে গেছে! এখন মানুষ আমাকে কালাম নামে ডাকে না, ডাকে কাউল্যা বলে। ভিক্ষুকের আবার এত বাহারি নামের দরকার কী! ওই কাউল্যাই সই। পরিচিত কেউ কেউ মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে—কালু কেমন আছ ? কাউল্যার চেয়ে কালু ভালো। কালু নামটা যে ভালো তা বোঝাব কাকে ? আর বোঝাবই বা কোন মুখে! এক কালের মোহাম্মদ কালামউদ্দিন এখন যে ভিক্ষুক, কোমর ভাঙা কাউল্যা ভিক্ষুক। ভিক্ষুকের আবার বোঝানো কী ? অন্যের দয়ায় যে বেঁচে আছে, তার জ্ঞানগম্যি দেওয়ার সাহস কোথায় ? তাই কাউল্যা ডাকলেও সাড়া দিই, কালু ডাকলেও দিই, এমনকি মাগইন্যার পোলা বলে কেউ তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলেও মুখে রা কাড়ি না।

পাড়া-মহল্লায়, হাটে-মার্কেটে, স্কুল-মসজিদ-মন্দিরের সামনে, সিনেমাহল-রেলস্টেশনে, সীবিচে, পার্কে হেঁটেহুঁটে ভিক্ষা করলে অনেক টাকা। যারা এসব জায়গায় ভিক্ষা করে তাদের মুখে শুনেছি হাটবাজারের মানুষেরা বেশি কঞ্জুষ। ভিক্ষা দিতে চায় না। 'মাফ কর, যাও যাও সামনে থেকে'—এসব বলে বেশির ভাগ সময়ে ঝাঁঝিয়ে ওঠে তারা। ঝাঁঝিয়ে ওঠার কারণও আছে। কম টাকা দিয়ে অধিক সদাইয়ের আশা নিয়ে তাদের বাজারে আসা। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মানুষ ওরা। গিয়ে দেখে গতদিনের বাজার দরের চেয়ে আজকের বাজার দর অনেক বেশি চড়া। চক্ষু তখন চড়কগাছ। মস্তিষ্ক গুলিয়ে যায় তাদের। অসহায় মানুষগুলোর সামনে ভীমবেগে সর্ষেফুল ঘূর্ণিত হতে থাকে। ওই নিদাঘ সময়ে কেউ যদি সামনে হাত পাতে, কার ভালো লাগে বলুন! তখনই ভিক্ষুকদের শুনতে হয়—দূর দূর, ছেই ছেই।

স্কুল-কলেজ, মন্দির-মসজিদ-মাজারের সামনে, সীবিচে, পার্কে কিন্তু ভিন্নচিত্র। ওখানকার মানুষগুলোর মন নরম থাকে। ভয়ে নরম আর আনন্দে নরম। ফেল করার ভয়, দোজক-নরকে যাওয়ার ভয়। ভীতিতাড়িত মানুষ একটু দিশেহারা থাকে। এই দিশেহারা অবস্থারই সুযোগ নেয় ভিক্ষুকরা। 'গরিবগুর্বাদের দুই চাইরটা ট্যাহা দিয়া যানগো খালা, ভালো পাস দিবো আফনাদের পোলাপাইন, আফনারে আর আফনার মায়ে-বাপের বেহেস্ত নসিব অইব'—এই রকম কথাবার্তা শুনে মানুষ পকেটে হাত দেয়। পাঁচ-দশ টাকার নোট যা হাতে উঠে আসে, তাই দিয়ে দেয় ভিক্ষুকদের। দিয়ে পরম শান্তি লাভ করে।

পার্ক বা সীবিচের অবস্থা অন্যরকম। পার্ক আর সীবিচের ইনকাম বেশি। তাও দুপুরের দিকে। দুপুর মানে এগারোটা থেকে তিনটে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত। স্কুল-

BanglaBook.org

কলেজ পালানো প্রেমিক-প্রেমিকা বা স্বামী চাকরিতে চলে গেলে কাজ আছে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসা পরকীয়ায় মত্ত গৃহবধূরা পার্ক-সীবিচে যায়। গায়ে গা লাগিয়ে বসে। গরম শ্বাস পড়ে একজনের ঘাড়ে-গালে আরেক জনের। হাতের আঙুল নিয়ে নাড়াচাড়া করে। হাত বিচরণ করে শরীরের নানা ঘুপচিতে। ওই সময় ভিক্ষুক উপস্থিত হয়। পার্কে-সীবিচে ভিক্ষুক-প্রেমিক, হিরঞ্চি-গেঁজেল, পকেটমার-চা-দোকানের বয়, ঠেলাওয়ালা-পাগল—সবারই অবাধ যাতায়াত। তবে ওদের অধিকাংশই গাছতলায়, বেঞ্চে শুয়ে বসে ঝিমায়। ওদের কাছে ভিক্ষা চেয়েও লাভ নেই। মানে-মর্যাদায় ওরা ভিক্ষুকের চেয়ে উত্তম নয়। ভিক্ষুকেরা এগিয়ে যায় ক্রীড়ামগ্ন প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে। প্রেমে বিঘ্নকারীদের কে-ই বা সহ্য করে! প্রেমিকই মোটা দাগের ভিক্ষা দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদেয় করে ভিক্ষুককে। উদ্দেশ্য দুটো—প্রেমিকার কাছে নিজের ইজ্জত বাড়ানো আর ভিক্ষুক বিদেয় করে পূর্বক্রিয়ায় শিগ্‌গির নিমগ্ন হওয়া।

এসব কথা শুনতে শুনতে আমার মনে বড় ইচ্ছে জাগে, বড় ঈর্ষা জাগে। আহা! আমি যদি ওদের মতো ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করতে পারতাম! কত কিছু দেখতে পেতাম! কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা হতো আমার! এখনকার চেয়ে কত বেশি আয় করতে পারতাম আমি! চলৎশক্তিমান ভিক্ষুকদের প্রতি হিংসাটা আমার ভেতরে ঘূর্ণিত হতে থাকে। আল্লাহ্, তুমি আমার কাছ থেকে সব কেড়ে নিলে!

অথচ একদিন আমার কাছে সব ছিল। স্ত্রী ছিল, ভাই-বেরাদর ছিল, পাড়াপড়শি ছিল; আর ছিল বিপুল আনন্দ। শুধু আনন্দ কেন, গর্বও ছিল। আনন্দ মুক্তিযোদ্ধার, গর্ব স্বাধীনতা অর্জনের।

২

যুদ্ধ লাগার আগের বছরই মা আমাকে বিয়ে করাল। বাপ ছিল না আমার। মা-ই ছিল আমাদের হর্তাকর্তা। আমাদের মানে আমি আর আমার দুই ভাইয়ের। মা আমার বড় কঠিন প্রকৃতির নারী ছিল। স্বামী হারানোর শোককে বুকের মধ্যে পাথর চাপা দিয়ে আমাদের মানুষ করতে লেগে গিয়েছিল মা। আইএ বিএ পাসও দিয়েছিলাম আমরা। মারা যাওয়ার আগে বাপ একতলা একটা বাড়িও করে দিয়ে গিয়েছিল। মা একটা ঘরে থাকত, তিন ভাই তিন ঘরে। আমি আইএ পাস দেবার পর মায়ের মাথায় ভূত চাপল। বিয়ে করাল আমাকে। বিয়ে করানোর আগে আমাকে বোঝাল একটা বউ ঘরে থাকলে তার কী কী সুবিধা হবে। শুধু তার সুবিধার কথা বলে মা ক্ষান্ত হলো না, আকারে ইঙ্গিতে আমার সুখ-শিহরণের কথা বলতেও মায়ের মুখে আটকাল না।

চাকরি করতাম আমি চিটাগাং স্টীল মিলে। জাপানি ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করত ওই কারখানায়। তাদের বাংলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব বর্তেছিল আমার ওপর।

বউটা আমার বাঁদরশ্রেণির ছিল। প্রাণ আর দেহ চাঞ্চল্যে টইটম্বুর। তার হিতাহিত জ্ঞান ছিল কম। ফটাফট কথা বলে ফেলত। তার স্পষ্ট কথায় কেউ ব্যথা পাচ্ছে কি না,

BanglaBook.org

সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করত না সে। পরিবারের সবাইকে সে নাচিয়ে ছাড়ত। সবার প্রতি ভালোবাসাও ছিল তার অগাধ। তার চরিত্রের কথা আপনাদের কীভাবে বোঝাব বুঝে উঠতে পারছি না। ও হ্যাঁ, একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারি আপনাদের। আমি তখন মুক্তিযুদ্ধে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আমার মধ্যে একটা উচাটন ভাব জেগেছিল। রেডিওতে আর জনমুখে যুদ্ধের কথা শুনতাম আর একটা প্রচণ্ড আলোড়নে চুরমার হতে থাকতাম। আজ বুঝেছি, সে আলোড়নের নাম দেশপ্রেম। দেশের টানেই বউ-মা-ভাই-চাকরি সব ছেড়েছুড়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম।

রামগঞ্জের দিকে তখন আমরা যুদ্ধ করছি। আমার অন্যতম সহযোদ্ধা ছিল রইসউদ্দিন। বড় রসিক ছিল সে। প্রায় সময় তার কাছে আমার বউয়ের গল্প করতাম। বউ যে অস্থির সেটা বলতাম, আমার তুলনায় বউ যে একটু বড়সড় তাও বলতাম। এক বিকেলে রইস আমাকে ডেকে বলল, 'হুন, তোর বউরে লই আঁই এগ্‌গা কবিতা রচনা কইচ্ছি। হুইন্‌বি নি ?'

আমি হেসে বলেছিলাম, 'হাঁছা নি!' তারপর কৌতুকী গলায় বলেছিলাম 'হুনা দেখি।'

রইসউদ্দিন সিরিয়াস গলায় আবৃত্তি করল—

হোলার তুনো মাইয়া ডাঙ্গর
এই বিয়াত নি ডক আছে,
আরও হুইনছি মাইয়া হিগা
টক্কি উডে তালগাছে।
আম হাড়ে, শুয়ারি হাড়ে
আরও হাড়ে তাল,
আরও হুইনছি মাইয়া হিগা
টক্কি হারৈ খাল।

আমি অবাক চোখে রইসউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। রইসউদ্দিন মিটি মিটি চোখে আমার দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হাসল। আমার বিস্ময়টা কমে এলে রইসকে বললাম, 'তুই আমার বউকে কোনোদিন দেখস নাই। দু'চার দিন তার কথা শুনছস। শুনেই এমন একখান কবিতা লিখলি তুই, যা হুবহু মিলে গেছে! কেমনে লিখলি তুই ?'

'ধুর! ইয়ানরে কবিতা কয় নি ? চোডবেলা মার কাছে এরকম কিছু একখান হুইনছিলাম, হেইটাই তোর কাছে মারি দিলাম।' রইসউদ্দিন হালকা চালে বলেছিল।

'তুই যাই কছ আর তাই কছ, তোর প্রতিভা আছেরে দোস্ত! আমার বউয়ের আচার আচরণের সঙ্গে এক শ'ভাগ মিলে গেছে।'

আমার কথা শুনে মিষ্টি মিষ্টি হেসেছিল রইসউদ্দিন।

BanglaBook.org

তো শেষ পর্যন্ত এই বউও আমার কাছে থাকল না, রইসউদ্দিনও আমার হয়ে থাকল না।

বউয়ের কথা পরে, আগে রইসের কথা বলি। শুভপুরের অলিনগর গাঁয়ে আমরা যুদ্ধ করছিলাম। আমাদের কমান্ডার ওয়ালিউল্লাহ, তার অধীনে বিশ-বাইশজন মুক্তিযোদ্ধা। অলিনগরের সামাদ মিয়ার গোয়ালঘরটি বাড়ির পেছনে। গোয়াল ঘরটি জংলা মতন জায়গায়। একটা বড় বটগাছ গোয়ালঘরটিকে ছায়া দিয়ে রেখেছে। আমরা ওই গোয়ালঘরেই আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমাদের বেশিরভাগ অপারেশন রাতের বেলায় হতো। দিনের বেলায় ওই গোয়ালঘরেই কাটাতাম আমরা। বটগাছের উঁচু ডালে বসে আমাদের কেউ না কেউ পাহারা দিত। চোখ রাখত একটু দূরের ফেনী নদীর বেড়িবাঁধে। ওই বেড়িবাঁধেই পাকুরা আস্তানা গেঁড়েছিল।

ওয়ালিভাই একদিন বললেন, 'ওই বেড়িবাঁধেই অপারেশন চালাতে হবে। রেডি হও তোমরা।'

এক সন্ধেয় আক্রমণ চালালাম। খুব বেশি সুবিধা করতে পারলাম না আমরা। সবাই পালিয়ে গেলেও রইস আর আমি ধরা পড়লাম। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের সোমবার ছিল সেদিন।

আমাদের দুজনকে বেড়িবাঁধের ওপর নিয়ে যাওয়া হলো। তখন তখনই গুলি করা হলো রইসউদ্দিনকে। গুলি খাওয়ার পর একটি আওয়াজও করল না রইস। শুধু মাটিতে পড়ে প্রাণ না যাওয়া পর্যন্ত বৃত্তাকারে ঘুরে গেল সে। তার শরীর স্থির হয়ে গেলে আমার দিকে নজর দিল এক পাকুসেনা। 'শালা বেহেনচোদ' বলে আমার কোমর বরাবর বিশাল এক লাথি কষাল। 'ও মারে' বলে বেড়িবাঁধ থেকে গড়িয়ে পড়লাম নিচে! নিচেই ফেনী নদী। জলে পড়েই ডুব দিলাম। পানির অনেক নিচ থেকে আলোর ঝলকানি দেখতে পেলাম। কানে ভেসে এল অজস্র গুলির আওয়াজ। ঘোর আঁধারে পাকুরা আমাকে খুঁজে পেল না। দম বন্ধ করা আমাকে নদীস্রোত অনেক দূরে নিয়ে গেল।

ভাটির দিকের এক গাঁয়ে আশ্রয় পেয়েছিলাম আমি। নদীর কূলে পড়ে ছিলাম। জলে কাঁদায় মাখামাখি। হুঁশ ছিল না আমার। বাহ্যকর্ম করতে এসে প্রতুলবাবু আমাকে দেখতে পেয়েছিলেন। ধরাধরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে।

হুঁশ ফেরার পর বুঝতে পেরেছিলাম—কোমর থেকে নিচের দিকের অঙ্গে কোনো চেতনা নেই আমার। আমি উঠে বসতে চাইলাম। পারলাম না। আশ্চর্যের ব্যাপার, অবশ অঙ্গে কোনো ব্যথাবেদনা নেই। প্রতুলবাবুর পরিবারের অশেষ যত্নে আমি স্বাভাবিক হয়ে উঠতে লাগলাম। কিন্তু আমি হাঁটার ক্ষমতা হারালাম। ধরে বসিয়ে দিলে টলোমলোভাবে বসে থাকতে পারি। কিন্তু নিজশক্তিতে দাঁড়িয়ে থাকার সকল ক্ষমতা আমি হারিয়ে ফেললাম। প্রতুলবাবুরা আমাকে ধরে ধরে পায়খানায় নিলেন, গোসলখানায় নিলেন। আজ ভাবি—তাঁরা কোন স্বার্থে আমায় নিকটাত্মীয়ের মতো যত্ন করেছিলেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধের সময় আশ্রয় দিয়েছিলেন! পৃথিবীতে এমন

BanglaBook.org

কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা দেশকে বেহেস্তের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন; দেশের মুক্তির জন্যে যাঁরা যুদ্ধ করেন জীবন বাজি রেখে, তাঁদের সেবা করতে যাঁরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না, প্রতুলবাবুরা ওরকমই। নইলে কেন বিপুল ধ্বংসের মধ্যদিয়ে যখন দেশ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগোচ্ছে, সাম্প্রদায়িক স্বস্তি যখন একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, ঠিক ওই সময়েই প্রতুলবাবু আমাকে তাঁর ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলেন, সেবাযত্ন দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন!

যুদ্ধশেষে যখন বাড়িতে ফিরলাম, হুইল চেয়ারে করেই ফিরেছিলাম আমি, কী হইচই আমাকে নিয়ে! পতেঙ্গার মানুষ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কী ভালোবাসা! কী শ্রদ্ধা! তাদের চোখে আমার গর্ব চিক চিক করছে। আমার বাড়িটা একটা পবিত্র জায়গায় পরিণত হয়েছিল। তবে তা কিছুদিনের জন্যে।

এক দুই তিন মাস করে করে বছর গড়াল। আমার শারীরিক অক্ষমতা আমার জীবনে কাল হয়ে দাঁড়াল।

প্রথমে বিদ্রোহ করল আমার স্ত্রী। উচ্ছ্বাসে ভরা যে স্ত্রীকে রেখে গিয়েছিলাম, সে সালমা হঠাৎ করে চুপসে গেল। যে স্বপ্ন নিয়ে সালমা আটমাস অপেক্ষা করেছে, পঙ্গু আমাকে দেখে তার সে স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেছে। আমার যে শুধু নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে গেছে তা নয়, নিম্নাঙ্গের সক্ষমতাও নষ্ট হয়ে গেছে।

বলা নেই কওয়া নেই একদিন আমার শ্বশুর আর সম্বন্ধী এসে উপস্থিত। ভূমিকা ছাড়া শ্বশুর বললেন, 'আমরা সালমাকে নিয়ে যেতে এসেছি, সারা জীবনের জন্যে।'

মা সামনে এসে দাঁড়াল, 'বেয়াই, বলছেন কী! মেয়ে নিয়ে যাবেন! আমার ছেলে দেশের গৌরব, মুক্তিযোদ্ধা! তার বউ নিয়ে যাবেন!'

'মুক্তিযোদ্ধা দেশের জন্যে, আমার মেয়ের জন্যে নয়। পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা দিয়ে আমার মেয়ে কী করবে?' নিষ্করুণ গলায় শ্বশুর বললেন।

মা দ্রুত ঘরে ঢুকে গেল। সালমাকে টানতে টানতে নিয়ে এল। ভেজা চোখে বলল, 'তুমি বল বউ, আমার ছেলের অবর্তমানে তোমাকে আমরা কোনো কষ্ট দিয়েছি কখনো? তোমার বাপ-ভাই তোমাকে নিয়ে যেতে চাইছে, তাদের বল মা তুমি যাবে না, মুক্তিযোদ্ধা স্বামী তোমার অহংকার।'

সালমা কিছু বলবার আগে শ্বশুর বলে উঠলেন, 'ও কী বলবে? ওর ভালোমন্দ আমরা বুঝি। আপনি যত্ন নিয়েছেন ঠিক আছে, কিন্তু মেয়ে কিসের জন্য স্বামীর ঘর করবে?' তারপর একটু থেমে অনেকটা স্বগত কণ্ঠে বললেন, 'আপনার ছেলে তো স্ত্রীকে দেওয়ার মতো সবকিছু হারিয়ে বসে আছে।'

বেয়াইয়ের ইঙ্গিতপূর্ণ কথা শুনে মা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। আঁচলে চোখমুখ চেপে অন্য ঘরে দ্রুতপায়ে চলে গেল মা। এই সময় আমার সম্বন্ধী বলে উঠল, 'যা যা সালমা, তৈরি হয়ে নে। অনেক বেলা হয়ে গেল। বাড়িতে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধে হয়ে যাবে।'

BanglaBook.org

আমি অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে বললাম, 'এই দুপুরবেলা কুটুম্ববাড়ি থেকে না খেয়ে যাবেন কী করে ? ডালভাত যা হয় দুটো খেয়ে যান।'

'না, না। ঠিক আছে, ঠিক আছে। বাড়িতে গিয়ে খাব ক্ষণ।' তারপর সালমার দাদা সালমাকে তাড়া দিয়ে বলল, 'আর দেরি করিস না।'

সালমা প্রতিবাদ করবে—এই আশা ছিল আমার। কিন্তু সালমা কিছুই বলল না। ঘরের ভেতর চলে গেল। চলে যাবেই না কেন ? গেল এক বছরে সে তো অতৃপ্ত রাত কাটিয়েছে। একজন যৌবনবতী নারীর অতৃপ্ত রাত কাটানো যে কত অসহনীয়, তা আমি আগে না বুঝলেও গত এক বছরের রাতগুলোতে তো টের পেয়েছি!

টুপ করে আমার পায়ে সালাম করে উঠানে নেমেছিল সালমা। মায়ের দরজায় তখন খিল ছিল। আমার দুই ভাই শ্বশুর আর সম্বন্ধীর হাতে পায়ে ধরে কত যে অনুনয় বিনয় করল! কিন্তু তাতে কোনো কাজ হলো না। আমি বারান্দায় বসে বসে আমার জীবনের এই নাটকটি দেখে গেলাম।

সালমা চলে যাওয়ার পর আমার মনের শক্তি ও স্বস্তি দুটোই নষ্ট হয়ে গেল। পাগল পাগল ভাব জন্মাল আমার মধ্যে। কারও কথা শুনতে আমার ভালো লাগে না। কারও সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলতে আমার ভালো লাগে না। মা-ভাইয়ের কথায় অকারণে তেড়ে উঠতে শুরু করলাম আমি। ডালে লবণ হয়নি বলে এক দুপুরে ভাতসহ থালা আছড়ে ফেললাম আমি। পাশে মেজভাই জসিম ছিল। সেদিন হয়তো তারও মেজাজ খারাপ ছিল। সে চিৎকার করে উঠল, 'পাগলামিতে পেয়েছে তোমাকে, হ্যাঁ! তোমার খারাপ ব্যবহার আমরা অনেক সহ্য করেছি, আর না। খাচ্ছ তো মাগনা। আমাদের কামাইয়ের টাকায় পেট পুরাচ্ছ। আমার বউ না হয় ভুলে ডালে লবণ দেয় নি, তাই বলে থালা আছড়ে ফেলা! আর না। তোমার পথ তুমি দেখ। তোমার সঙ্গে আমরা আর নাই।'

তার পাশে ছোট ভাই দেলোয়ার বসা। সে জসিমের কথার প্রতিবাদ করল না। বুঝলাম—দুই ভায়ের পূর্বপ্রস্তুতি ছিল।

মা হা হা করে উঠল, 'কী বলছিস জসিম তুই! কালাম তোর বড় ভাই। পৃথক হওয়ার কথা বলছিস! খাবে কী সে!'

এবার দেলোয়ার বলল, 'কী খাবে আমরা কী জানি। তুমি ইচ্ছে হলে আমাদের সঙ্গে খাবে। খেতে না চাইলে আমাদের আপত্তি নাই।'

মা কেঁদেকেটে ভাইদের মুখে পিঠে হাত বুলিয়ে ওদের কথা ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে অনেক অনুনয় করল। কিন্তু দুই ভাইয়ের এক কথা—কাল থেকে পৃথক চুলায় রান্না হবে।

উঠানের মাঝখানে বেড়া উঠল। বারান্দার মাঝখানে দেয়াল উঠল।

বুড়ি মা আমার, আমাকে নিয়ে অকূল সমুদ্রে পড়ল।

BanglaBook.org

ঘরে যা কিছু ছিল এক এক করে সব শেষ হয়ে গেল। চেয়ার, টেবিল, খাট, থালা-ঘটিবাটি—সবকিছু একে একে বেচে দিলাম।

শেষ পর্যন্ত ভিক্ষাবৃত্তিকেই বেছে নিতে হলো আমাকে। প্রথম প্রথম কী শরম যে লাগত! মা যখন হুইল চেয়ার ঠেলে ঠেলে আমাকে চৌরাস্তার মোড়ে নিয়ে যেত, পথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অঝোর ধারায় কাঁদতাম। আহারে পথ! তোর বুকের ওপর দিয়েই তো একদিন আমি দাপিয়ে হেঁটে বেরিয়েছি! কাঁধে বইয়ের ঝোলা নিয়ে পতেঙ্গা হাইস্কুলে গেছি, চট্টগ্রাম কলেজে গেছি! তোর ওপর দিয়েই তো একদিন আমি সালমাকে আমার ঘরে এনেছি। তোর ধূলি মেখেই তো বীর মুক্তিযোদ্ধার বেশে আমি আমার বাড়িতে ফিরেছি।

আর আজ! আজ আমি তোর বুকের ওপর দিয়েই ভিক্ষা করতে যাচ্ছি! ভিক্ষা করতে যাচ্ছি—কাদের কাছে ? যারা আমাকে আনন্দের অশ্রুতে ভাসতে ভাসতে একদিন স্বাগত জানিয়েছিল এই গাঁয়ে, এই পতেঙ্গায়। বীর মুক্তিযোদ্ধা আমি আজ তাদের কাছে মাগইন্যার পোলায় পরিণত হলাম।

এরপর দিন গেছে, রাত গেছে। মোস্তাক-ডালিমদের মতন কুলাঙ্গারদের উত্থান ঘটেছে এই দেশে, জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতার হাতবদল হয়েছে। স্বাধীনতাবিরোধীদের গাড়িতে জাতীয় পতাকা উড়েছে। খাল কাটার গান শুনেছি, উন্নয়নের জোয়ারে দেশ ভেসে গেছে। শত শত সুটকেসে করে সৌদি আরবে, মালয়েশিয়ায়, সুইজারল্যান্ডে লক্ষ কোটি ডলার পাচার হয়েছে। কাউকে এশিয়ার সূর্যসন্তান উপাধি দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করে কেউ পল্লীবন্ধু উপাধিকে নিজের নামের আগে যুক্ত করে নিয়েছে। এই দেশে সাধু চোরে পরিণত হয়েছে, চোর সাধুত্বের তকমা এঁটে লম্বাচওড়া ভাষণ দিয়ে দিয়ে সাধারণ জনগণের স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে ঠেলাওয়ালা, রিক্‌শাওয়ালা, ভিক্ষুক। আর পাকুদের দোসর রাজাকার, শান্তি কমিটির সভাপতিরা হয়েছে দেশের হর্তাকর্তা।

সূর্য আকাশে ওঠে, ডুবেও একসময়। রাত এগোয় সকালের দিকে। এইসব হর্তাকর্তাদের হাত থেকে একদিন ক্ষমতা আসে স্বাধীনতার পক্ষের হাতে।

দালাল আর হত্যাকারীদের, পাকিস্তানি দোসর আর ধর্ষকদের, লুণ্ঠনকারী আর সাম্প্রদায়িকদের বিচারকার্য শুরু হয় একসময়। ধরা হয় এদের।

পতেংগার কাটগড়ের চৌমুহনীর বটগাছের নিচে বসে বসে আমি ভিক্ষা করি আর রাষ্ট্র ক্ষমতার রূপ-রূপান্তর দেখি। শুনি—বিচারের রায়ের খবর, শুনি—শাহবাগের গণজাগরণের সংবাদ, শুনি—রাজাকার প্ররোচিত শাপলাচত্বরের হেফাজতি সমাবেশের খবর। আমার সামনে দিয়ে বিরাট বিরাট মিছিল যায়। ধ্বনি ওঠে—'আমাদের দাবি মানতে হবে, যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে।' 'ফাঁসি চাই ফাঁসি চাই রাজাকারের ফাঁসি চাই।' 'তুমি কে, আমি কে ? বাঙালি, বাঙালি।' 'জামাতে ইসলাম, ম্যাড বাই পাকিস্তান।'

BanglaBook.org

আমার পাশে বসে জুতো সেলাই করে হরিপদ। খিদে লাগলে ওকে দিয়ে চা-সিঙাড়া আনাই, দুজনে ভাগযোগ করে খাই। পেসাব ধরলে কাঁদে ঝুলিয়ে একটু দূরের ঝোপের ধারে আমাকে নিয়ে যায় হরিপদ। অবসর সময়ে নানারকম সুখের কথা দুঃখের কথা বলে। কখনো মনোযোগ দিয়ে শুনি, কখনো শোনার ভান করি।

সে বিকেলে ভিক্ষা চাওয়ার ঝোঁক পেয়ে বসেছিল আমাকে। জোরে জোরে বলছিলাম, 'একটা দুইটা টাকা দেন বাজান, গরিব মানুষ খেতে পাই না। বুড়ি মা ঘরে।'

ঠিক ওই সময় একটা বিশাল মিছিল এল। সবারই জঙ্গি চেহারা। হাতে লাঠিসোঁটা। দেশি অস্ত্র ঝিলিক দিচ্ছে কারও কারও হাতে।

হিংস্র চেহারার একজন গলা ফাটিয়ে বলছে, 'সাঈদীর মুক্তি চাই,' জনতা আওয়াজ তুলছে—'দিতে হবে। নইলে গদি ছাড়তে হবে।' 'তথাকথিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা চলবে না, চলবে না।' 'নাস্তিকদের ফাঁসি চাই, দিতে হবে, দিতে হবে।'

আমি বলে উঠলাম, 'কুত্তার বাচ্চারা কী বলছে হরিপদ! বলছে কী হারামির বা...।'

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই হরিপদ প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার মুখ চেপে ধরল। বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে চাপাস্বরে বলে উঠল, 'কী বলছ কালুদা? শুইনতে পাইলে শেষ কইরা ফেইলব তোমারে।'

আমার মুখ দিয়ে প্রচণ্ড গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরিয়ে আসতে লাগল।

হরিপদ অবিরাম বলে যেতে লাগল, 'শান্ত হও দাদা, শান্ত হও। উত্তেজনা কমাও।'

হরিপদের কথা আর আমার তীক্ষ্ণ গোঁ গোঁ শব্দ মিছিলের তীব্র শ্লোগানে হারিয়ে যেতে থাকল।

আমি হিস হিস শব্দে প্রস্রাব করে দিলাম। আমার লুঙ্গি, হুইলচেয়ার ভিজে প্রস্রাব মাটিতে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

মুখ থেকে হাত সরিয়ে অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হরিপদ জিজ্ঞেস করল, 'একি করলা দাদা! মুইত্যা দিলা! তোমার পেসাব আইছে, আমারে কইলা না ক্যান! ঝোপের ধারে লইয়া যাইতাম আমি তোমারে!'

আমি আস্তে আস্তে বললাম, 'এই মুত ঝোপের ধারের জন্যে না। এই মুত ওই হারামজাদাদের মুখের জন্যে।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org